দেবব্রত বিশ্বাস

ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৮৫
তৃতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৩৮৭
চতুর্থ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮৯
পঞ্চম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৯৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
এইচ পি. রায় এ্যাণ্ড কোম্পানী
৭৩/এ আমহার্স্ট রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র
বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থের উপস্বত্ব লেখক কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত মহিলাভবন এবং বাল্যভবনের সেবায় অর্পিত হইল।

ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত

লেখক নই, হতেও চাই না, তবুও লিখলাম, কিন্তু কেন ?

১৯৭১ সনের আগস্ট মাসের শেষে আমি আমার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলাম। তারপর প্রায় দীর্ঘ সাত বৎসর পার হতে চলল। বাল্যকাল থেকেই আমার শ্বাসরোগ—এই নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিলাম। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের জোরও অনেক কমে গিয়েছে—তাই নানা ধরনের ব্যাধিও ঘাড়ে চেপে বসেছে। চুপ করে সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, কারণ চিকিৎসকরাই কিছু করতে পারছেন না, আমি আর কী করতে পারি। গত কয়েক বৎসর ধরে দেখতে পাচ্ছি একটি নতুন উপসর্গের আবির্ভাব ঘটেছে—এটাকে উৎপাতও বলা যেতে পারে; কিন্তু এই উৎপাত শরীর অথবা মনের পক্ষে একেবারেই অনিষ্টকব নয়, এটা হল ভালোবাসার উৎপাত। এই উৎপাতকারীদের দলে বহু চেনামুখও আছে, আবার অচেনাদের দলও কম নয়। তাঁরা আবার নানা শ্রেণীর।.

১। একটি শ্রেণীতে—আমার চাইতে বয়সে বড়ও আছেন, আবার বয়সে ছোটও আছেন। আমার যৌবনকালে গণ-চেতনা-উদ্বুদ্ধ করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম বলেই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, আমার প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসার টান আমি বেশ ভালোভাবেই অনুভব করি। তাঁরা আমার খোঁজখবর নিতে প্রায়ই আমায় দর্শন দিতে আসেন। এই শ্রেণীতে আমাদের অফিসের কয়েকজন সহকর্মী, যাঁরা এখনও অবসর গ্রহণ করেন নি তাঁরাও আছেন।

২। আরেকটি শ্রেণীতে আছেন কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী—তাঁদের মধ্যে কেউ এদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করেন, আবার অনেকেই ভারতের বাইরে নানা দেশেবিদেশে চাকরিবাকরি করেন। তাঁরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ তো রাখেনই, কলকাতায় এলেই আমার ঘরে এসে তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসা আমায় জানিয়ে যাবেনই।

৩। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় এবং বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) বাস করেন এমন বেশ কয়েকজন তরুণ তরুণী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরাও আমার সঙ্গে চিঠির মাধ্যমেই যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চিঠি সত্যি চিঠির মতো চিঠি। আবার কয়েকজনের চিঠিতে জবাব দেবার মতো কিছুই থাকে না—শুধু ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করতেই হয়। যাঁদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে চান—তাঁরা জানেন আমি অসুস্থ, তাই কে বা কারা আমার দেখাশোনা করেন তাও জানতে চান। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সনের একটি কাহিনীর উল্লেখ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। কলকাতার বাইরে একটি শহরের একজন মহিলা, কীভাবে জানি না, আমার ঠিকানা যোগাড় করে আমায় একটি চিঠি লেখেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি চিঠির আদানপ্রদানের সময়, তাঁকে আমার ভাঙা স্বাস্থ্যের কথা জানিয়েছিলাম, এবং আরো লিখেছিলাম যে ভাঙা স্বাস্থ্যের জন্য অকর্মণ্য অবস্থায় আমি একটি ঘরে একলাই দিন কাটাই। মহিলাটি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য গভর্নরকে চিঠি দিয়ে লিখে প্রার্থনা জানালেন যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমায় কোনো হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বিনা খরচে আমার সমস্ত

চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মহামান্য গভর্নরের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী ২০-৬-৭৭ তারিখে চিঠি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগকে এই ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ যথারীতি ৯-৮-৭৭ তারিখে S.S.K.M. হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখলেন এবং আমাকেও সেই চিঠির একটি প্রতিলিপি পাঠালেন। চিঠিখানা পেয়েই আমি স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তাকে এবং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাবার মতো অবস্থা আমার তখনো হয়নি। S.S.K.M. হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে তারিফ করতেই হয়, কারণ আমার উপর্যুক্ত চিঠি হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই একজন চিকিৎসক আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি ওই হাসপাতালের R.M.O। আমার অনুরোধে তিনি আমার রক্তের চাপ মেপে জানালেন যে রক্তের চাপ স্বাভাবিকই আছে। উনি যখন আমার অসুখের বিবরণ জানতে চাইলেন তখন সেই মহিলাটির গল্প আদ্যোপান্ত বললাম, গল্পটি তিনি খুব উপভোগ করলেন এবং বিদায় নিলেন। এই ধরনের ভালোবাসার উৎপাত অন্য কোনো ভাগ্যবানের অদৃষ্টে জুটেছে কিনা তা আমার জানা নেই।

৪। আমায় যাঁরা আমার যৌবনকাল থেকেই ভালোবাসেন ও স্নেহ করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রায়ই আমায় কিছু লিখে ছাপিয়ে প্রকাশ করতে বলেন। জিজ্ঞেস করি, "কী লিখব ?" কেউ বলেন "আত্মজীবনী" ; আমি বলি "আমার আত্মজীবনী তো এক পৃষ্ঠায় শেষ হয়ে যাবে। আবার কেউ বলেন, "আপনার সংগীত-জীবন"। "সংগীত-জীবন" নাম দেওয়া যেতে পারে এমন কোনো আলাদা বা বিশেষ ধরনের জীবনধারার অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনেও হয়নি। সেই বাল্যকালে কবে থেকে গান গাইতে শুরু করলাম তা আমার

মনেও নেই—গান গাইছি-তো-গাইছি-তো গাইছি। কোনো ওস্তাদ অথবা শিক্ষকের কাছে নাড়া বেঁধে বা রীতিমতো লেখাপড়া শেখার মতো করে গান আমি কখনও শিখিনি। ছোটবেলার দিনগুলি থেকে শুরু করে, বড় হয়েও শুধু গান শুনেছি আর গেয়েছি। কোনো সংগীত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গান শিখবার সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে কখনো জোটেনি। তাই সাংগীতিক ব্যাপারে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখবার মতো আমার জীবনে কিছুই ঘটেনি। তবুও আমার সেই হিতৈষী বন্ধুরা আমায় লিখতে উৎসাহিত করে বিরামবিহীন ভালোবাসার উৎপাত চালিয়েই যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অকপটে স্বীকার করতে আমার কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা নেই যে আমার সারাজীবন কেটে গিয়েছে কেরানীগিরি করে ; এরই মধ্যে কয়েকটি বৎসর কেটেছে গণ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা শহরে-গ্রামে-গঞ্জে-হাটে-বাজারে, নানা ধরনের দেশাত্মবোধক গান গেয়ে এবং বাকী সময় আমার ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করে। সাহিত্যচর্চা করার কোনো অবকাশ এবং সুযোগ আমি পাইনি। ১৯৫৩ সনে চীনদেশে গান গাইতে গিয়েছিলাম—দেশে ফিরে আসার পর আমার বামপন্থী বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে, আমার অপটু কলমে, চীনদেশে আমার অভিজ্ঞতার কথা ১৯৫৩ সনের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাপ্তাহিক ধারায় কয়েকটি গল্প ছাপিয়ে প্রকাশ করার জন্য লিখে পাঠিয়েছিলাম এবং সেগুলি ছাপানো হয়েছিল। ১৯৭৮ সনে বৈশাখ মাসে খালেদ চৌধুরীর সাহায্যে 'অন্তরঙ্গ চীন' নাম দিয়ে ঐ পুরনো লেখাগুলি একটি বইএর আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পর্যন্তই আমার দৌড়। সুতরাং কিছুতেই আর কিছু লিখতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমার বন্ধুদের বারংবার অনুরোধে মনস্থির করলাম—একবার চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার মনে আছে

আমি জন্মেছিলাম "ম্লেচ্ছ" হয়ে—শেষজীবনে রবীন্দ্রসংগীত জগতে হয়ে গেলাম "হরিজন"—কেন "ম্লেচ্ছ" এবং কী করে "হরিজন" এই ব্যাপারটি জানবার ঔৎসুক্য হয়তো অনেকের হতে পারে—কারণ যতই বিনয় করি না কেন, আমার বেশ ভালো করেই উপলব্ধি হয়েছে যে অগণিত রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমিকদের অকৃত্রিম এবং অকুণ্ঠ ভালোবাসা সারাজীবন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তাই ভাবলাম এই ব্যাপারেই কিছু লিখতে চেষ্টা করি যাতে ওই রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমিকরা আমার "হরিজন" হয়ে যাবার ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হতে পারেন।

আমার কেরানী জীবন

প্রথমে একটু সংক্ষেপে আরম্ভ করতে চেষ্টা করি। এই সব লেখা লিখতে আরম্ভ করেছি ১৩৮৫ সালের পয়লা বৈশাখ থেকে অর্থাৎ ১৯৭৮ সনের ১৫ই এপ্রিল থেকে। ১৩৮৫ সাল বা ১৯৭৮ সনের ৬ই ভাদ্র আমার সাতষট্টি বৎসর পার হয়ে যাবে। আমি হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করতে আরম্ভ করেছিলাম ১৯৩৪ সনে—তাও আবার বিনা মাইনেতে। ১৯৩৫ সনের মে মাসে কোম্পানীর পাকা খাতায় আমার নাম উঠল—মাইনে হল পঞ্চাশ টাকা। ১৯৫৬ সনে জীবনবীমা অফিসগুলির জাতীয়করণ হয়ে গেল। তখন থেকে আমি লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কেরানী হয়ে গেলাম—এই কেরানীজীবন শেষ হয়ে গেল ১৯৭১ সনের আগস্ট মাসে, যখন আমার বয়স হয়ে গেল ষাট।

আমার এই সুদীর্ঘ জীবনের ১৯৩৭-৩৮ সন থেকে প্রায় উনিশ-কুড়ি বৎসর বেশ বাঁদিকে হেলে কেটে যাচ্ছিল এবং বেশ আনন্দেই কাটছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমার মনে রাজনীতির ব্যাপারে কী রকম জানি একটু সংশয়ের উদয় হয়েছিল। হঠাৎ ১৯৬২ সনে দেখলাম বাঁদিকে নিদারুণ অগ্নিকাণ্ড—পরস্পর বিরোধ ও বিদ্বেষের আগুন। ভীষণ দমে গেলাম। সুদীর্ঘকাল এক সঙ্গে কাজ করে যাঁদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম, তাঁদের কিছু অংশের ভালোবাসা থেকে আমি বঞ্চিত হবো এটা

আমার পক্ষে নিদারুণ অসহ্য মনে হয়েছিল। বহু বৎসরের অভ্যাসের ফলে, আমার মনটাও বাঁয়ে হেলে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—তাই মনটাকে অন্য কোনো ধরনের নতুন পথে চলতে বা নতুন পথ ধরতে কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। মনের বেগই যদি থেমে যায় তা হলে চলতেও পারি না, তাই থেমে যেতে হল। শুধু কি এই? যে অফিসের কর্মীদের ইউনিয়নের সূত্রপাত থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম সেখানেও দেখি প্রচণ্ড বিভেদের আগুন। নিজেদের সাধ্যমত আগুন নেভাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই করতে পারিনি—তাই নিরাশ হয়ে ইউনিয়ন থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিলাম। এই সব কারণে নিজের অন্তরে যে যন্ত্রণাভোগ করেছি তা লিখে বোঝানো যাবে না। এরই মধ্যে একটু সান্ত্বনা পেয়েছি এই ভেবে যে, ওদের দু পক্ষের অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হয়নি। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর দীর্ঘ সাত বৎসর কেটে গেল কিন্তু এখনও দুই পক্ষের নেতারা এবং কর্মীরা আমার ঘরে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে যান। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৭১ সনের আগস্ট মাসে চাকরি থেকে আমার অবসর গ্রহণ করার আগে আমাদের অফিস ইউনিয়নের একদল কর্মী আমায় বিদায়-সংবর্ধনা (farewell) দেবার প্রস্তাব নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন; কিন্তু আমি সেই সংবর্ধনা সভায় যেতে রাজী হইনি, কারণ বিভক্ত ইউনিয়নের ব্যাপার আমার মোটেই মনঃপূত ছিল না। তবে ৩১শে আগস্ট ১৯৭১ তারিখে আমার 'এল আই সি'র (Life Insurance Corporation) ভাইবোনেদের নামে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমার সেই চিঠিখানা নাকি সাইক্লোস্টাইল করে ছাপিয়ে সবাইকে বিলি করা হয়েছিল। সেই চিঠির একটি প্রতিলিপি নিচে দিলাম।

আমার এলাইসির ভাইবোনেরা—

আজ ১৯৭১ সনের ৩১শে আগস্ট। আজকের দিনটি আমার জীবনে একটি দুর্বিষহ দুঃখের দিন। আজকের দিনের শেষে আমার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। কাল থেকে আমি আর L. I. C.-র কেউ না। মনে হচ্ছে কাল যেন আমার মৃত্যুদিন। আমার আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হবে ভাবলেই কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আমার মনের ভিতরটা তছনছ করে দেয়। কিন্তু আবার আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান ভাবি—কারণ আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে এবং যাঁরা হিন্দুস্থান বিল্‌ডিং-এ অন্যান্য অফিস থেকে এসেছেন, তাঁদের অনেকের কাছ থেকে যে অকৃপণ ও অকুণ্ঠ,ভালোবাসা আমি পেয়েছি তার কোন তুলনা নেই। আমার বদ্ধমূল ধারণা—যে ভালোবাসা আমি আপনাদের সবার কাছ থেকে এতোকাল পেয়েছি তা আমার মত L. I. C.-র সাধারণ কোনো কর্মীর ভাগ্যে জোটেনি। মাঝে মাঝে প্রবল বাসনা হয়েছে যে একদিন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগ নামক একটি কঠিন এবং দুরারোগ্য ব্যাধি আমায় কল্পনাতীতভাবে দুর্বল করে ফেলেছে। ভয় হয় আপনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কোনো কথা বলবার মত শক্তি হয়তো আমার একেবারেই থাকবে না। তাই স্থির করেছিলাম চিঠির মাধ্যমে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব। কিন্তু অনেকদিন চেষ্টা করেও কয়েকটি পঙ্‌ক্তির বেশী আমি লিখতে পারিনি।

আজ আমার শেষ দিন—তাই মনটাকে জোর করে বেঁধে নিয়ে স্থির করেছি আজ আপনাদেরকে লিখতে হবে।

১৯৩৪ সনে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানীতে প্রথম প্রবেশ করেছি—১৯৩৫ সন থেকে পাকা খাতায় আমার নাম তোলা হয়। এই দীর্ঘকালের ইতিহাসে অনেক ছোটবড় ঘটনা ঘটেছে। আজকাল প্রায়ই সেই সব ঘটনার কথা আমার মনকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে আমরা যেমন সংগ্রাম করেছি, আবার সবাই মিলে আনন্দ ভাগাভাগি

করে উপভোগ করেছি। পুরানো দিনের কথা যখন আমার অসুস্থ শরীরে একা একা ভাবি—বিপুল আনন্দে আমার মন ভরে ওঠে—আবার প্রচণ্ড দুঃখে মনটা মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে পড়ে।

দুয়েক মাস আগে একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের ফোটোগুলির মধ্যে দেখলাম একটি আট-দশ বৎসরের বালকের ছবি—কোলে তার একটি এক দেড় বছরের শিশু—তার ছোট ভাই। এই শিশু ভাইটিকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে অন্যান্য শরণার্থীদের সঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে সেও চলে এসেছে। তাদের বাবা-মা কোথায় সে জানে না—বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা তাও সে জানে না। প্রচণ্ড বিপদের মধ্যেও শিশু ভাইটিকে ফেলে দিয়ে সে একলা পালিয়ে আসেনি। তার শিশু ভাইয়ের প্রতি দরদ তাকে একটা দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। ভাবা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেও ভেসে উঠেছিল—বহুদিন পূর্বেকার ঘটনার একটি ছবি। সেবার হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষ আমাদের হেড্ অফিস ইউনিয়নের নাবিকদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই সময়, বোম্বাই শহরের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার কমরেড চারী, অন্য কোনো এক মামলার ব্যাপারে কলকাতায় এসে Broadway Hotel-এ ছিলেন। আমার সংগ্রামী ভাইরা, যাঁদের ওপর আমাদের মামলা চালাবার ভার ছিল—তাঁদের এমন কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না—বিদেশী ভাষায় কথা চালানো ব্যাপারেও এত পোক্ত হয়ে ওঠেনি। ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে আমার সামান্য একটু পরিচয় ছিল জানতে পেরে তাঁরা আমায় ধরেছিলেন ব্যারিস্টার সাহেবের পরামর্শ আদায় করে দিতে হবে। সেদিনকার সেই বালক-দাদার ছবিটি দেখে আমারও সেই পুরনো দিনটির কথা মনে পড়ে গেল। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল সেদিনকার ছবি। আমাদের সবাকার বিপদের দিনে আমিও তো আমার ভাইদের হাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম—কমরেড চারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম—ওদের দোভাষীর কাজও সাধ্যমত করতে হয়েছিল। কাজ সেরে ফিরে আসছিলাম—আমার ভাইরা—চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণগোপাল এবং আরো কয়েকজন কী খুশি

—পরস্পরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। বিপদের দিনে কেউ আমরা দলছাড়া হয়ে পড়িনি—আমাদের একতা ছিল অটুট তাই আমাদের মনোবল আমাদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু আজ?

মনে পড়ে আমদের হিন্দুস্থান বিল্‌ডিঙের রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠান-গুলির কথা। গত মে-জুন মাস বাংলাদেশে (পশ্চিমবঙ্গে) রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করা হল। অসুস্থতার দরুন আমার কোথাও যাওয়া হয়নি। ঘরে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি আমাদের ইউনিয়নের অনুষ্ঠানগুলির কথা। কী অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভাইরা এইসব অনুষ্ঠানগুলি অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতেন! মনে পড়ে যায়, চারতলায় স্টেজ তৈরী করে যথাযোগ্য রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে যখন আমার ভাইরা তাঁদের জর্জদাকে ডেকে নিয়ে তাঁদের কোন ভুলত্রুটি হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন—আমার মুখে তাদের কাজের প্রশংসা শুনে তাঁরা যে কী খুশি হতেন—সেই খুশি মুখগুলি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি দেখেছি, আমাদের সহকর্মীরা যাঁরা দূরাঞ্চলে থাকতেন, এমনকি অন্যান্য অফিসের বহু কর্মী খবর পেয়ে তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে মেজের উপর শতরঞ্চি পাতা আসন গ্রহণ করে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। আমার মনে পড়ে, অনুষ্ঠান চলাকালে স্টেজে বসে আমি লক্ষ্য করতাম—ওই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের গরমে, দর্শকদের কষ্ট লাঘব করবার উদ্দেশ্যে, রুপোলী ফ্রেমে পানীয় জলের গেলাস সাজিয়ে আমাদের ইউনিয়নের কর্মীভাইরা, নিজেদের শরীর যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে, এঁকেবেঁকে সংকীর্ণ পথ তৈরী করে ক্রমাগত পানীয় জল পরিবেশন করে যাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্য—তাতে অনুষ্ঠান 'চলার কোনো বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হত না। আমার এখনও মনে আছে—অনুষ্ঠানের শেষে ইউনিয়নের পাণ্ডা, কর্মী ও সভ্য সবার মুখ আমি লক্ষ্য করতাম; অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে তাঁদের মুখের দৃঢ়তার অভিব্যক্তি, অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যেত, তার বদলে দেখতে পেতাম একটা অপরিসীম তৃপ্তি সবার মুখে। পাণ্ডারা এসে জানাতেন—নিমন্ত্রিত অতিথিরা ও শিল্পীরা আমাদের

অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কে কি মতামত প্রকাশ করেছেন। আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠানের বিপুল সাফল্যে আমাদের ঐক্য আরও মজবুত হয়ে উঠত।

আজ হিন্দুস্থান বিল্‌ডিং থেকে রবীন্দ্রনাথ নির্বাসিত! এই নির্বাসনের মূলে আমিই দায়ী—তুচ্ছ অভিমানের বশে আমি নিজেকে আমার ভাইদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তাঁদেরকে এই ব্যাপারে পথ দেখাবার মত কেউ ছিল না জেনেও আমি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসিনি। আমার অন্যায়ের জন্য আজ আমি কী যে কষ্ট পাচ্ছি তা আপনাদেরকে বোঝাতে পারব না। আমার পাপ—তার কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা, আমি জানি না। আপনাদের প্রতি আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আশাকরি আপনারা ক্ষমা করবেন।

আর একটি বেদনার কথা আপনাদেরকে জানিয়ে আমি বিদায় নেব। "নানা ধরনের পুঞ্জীভূত কারণে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রাজনীতি ও অর্থনীতি বিপুল ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির মত ঝাঁকানিতে উলটে-পালটে যাচ্ছে—আমাদের দেশেও, তার ঢেউ প্রবল বন্যার মত প্লাবিত করে ফেলছে। এর ফলে আমাদের দেশের সমাজের সমস্ত স্তরেই নানা প্রকারের অনাসৃষ্টির আবির্ভাব ঘটেছে। এদেশে যৌবনের চিত্তসাগরে উত্তাল তরঙ্গ গর্জন—দেশের চতুর্দিকে অধৈর্যের হাওয়া এবং তাণ্ডবলীলা" L.I.C.-র কর্মী হিসাবে আমার জীবনের শেষ কয়টি বৎসরের অভিজ্ঞতা আমার মনকে প্রায়ই ভারাক্রান্ত করে তুলত। দলগত স্বার্থবুদ্ধি আমাদের L.I.C.-র কর্মীদের মধ্যে কী নিষ্ঠুরভাবে বিভেদ সৃষ্টি করেছে—তা কি ভাবে দূর হবে আমি জানি না। কোন পথ ভ্রান্ত, কোন পথ অভ্রান্ত তার বিচার করবার ক্ষমতাও আমার নেই। এই প্রসঙ্গে আমি হয়তো আমার ভাইদের কাউকে তর্কাতর্কি করার ছলে রূঢ় বা অপ্রীতিকর কথা বলে ব্যথা দিয়েছি। আজ আমি এইটুকু জোর গলায় বলতে পারি এবং বলব যে কাউকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে আমি কোনো কথা বলিনি এবং আপনারা বিশ্বাস করুন—কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ আমি কখনও পোষণ করিনি। তবু আজ আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি—আশা করি দয়া করে আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কয়েকটি লাইন কয়েক দিন ধরেই আমার কানে বাজছে—তাই লিখে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নেব—

"অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি তাই, সবার আজি প্রসাদবাণী চাই।"

ইতি আপনাদের
জর্জদা (দেবব্রত বিশ্বাস)*

অফিস থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আমার স্বাস্থ্য বেশ অবনতির দিকে যেতে শুরু করেছিল। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে খুব শোচনীয় অবস্থায় পড়ে গেলাম। ওই মাসের শেষ দিকে আমায় ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল। কী কারণে জানি না আমি হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম এবং অচৈতন্য অবস্থায় চার-পাঁচদিন

* আমার এই চিঠির প্রসঙ্গে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শেষে গানের কথা ছাড়া চিঠিতে কোটেশন চিহ্নের ভেতরের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি লেখা থেকে ধার করা।

আমাদের অফিসের ইউনিয়নের রবীন্দ্রজন্মোৎসবগুলিতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ও শিল্পী—বক্তৃতায়, আবৃত্তিতে, গানে, নৃত্যে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার এই চিঠিতে দুটি নামের উল্লেখ করেছি মাত্র—চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণগোপাল তাঁরা হলেন আমাদের সহকর্মী চন্দ্রশেখর বসু ও কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার বেশ কয়েক মাস আগের থেকেই আমি ছুটিতে ছিলাম—যাকে বলা হয় preparatory leave before retirement.

ছিলাম। সেই সময়ে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে আমি হয়তো আর সংজ্ঞা ফিরে পাব না। কিন্তু আমার হিতৈষী বন্ধুদের শুভেচ্ছায় ও সাহায্যে আমি চার-পাঁচদিন পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলাম এবং আস্তে আস্তে বিপদ কেটে গেল। আমার সেই বিপদের দিনে আমার কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু এবং আত্মীয় আত্মীয়া নানাপ্রকার সাহায্য দিয়ে আমায় যেভাবে ঋণী করেছিলেন, সেই ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার উদ্দেশ্যেই এই বিষয়টির অবতারণা করতে হল। তারা হলেন :

হেমন্ত মুখার্জি (যিনি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের মধ্যে আমাকে এখনও সব চাইতে বেশী শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন) এবং সন্তোষ সেনগুপ্ত (যাঁর সঙ্গে কলেজে পড়ার দিনগুলি থেকে আমার বন্ধুত্ব ছিল)। এঁরা দুজনেই, আমার চিকিৎসার ব্যাপারে নানা গাফিলতি নাকি হচ্ছিল তা লক্ষ্য করে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে নানা কড়া কথা শুনিয়েছিলেন এবং তার পরেই নাকি ওখানকার চিকিৎসকরা আমার চিকিৎসার ব্যাপারে খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বাবুল ব্যানার্জিও রোজ খোঁজখবর করতেন এবং আমার সব ওষুধ নিজের খরচায় এনে দিতেন।

আমার অফিসের দুইজন সহকর্মী—অজিত দাসগুপ্ত ও শান্তিনাথ চক্রবর্তী হাসপাতালে এসে সারারাত জেগে আমায় পাহারা দিতেন—কারণ তখন তো আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। আরেকটি যুবক—রতন মুখার্জিও রাত জাগতেন—তাঁর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। আমার জ্ঞান ফিরে পাবার পর কাকে জানি বলেছিলাম সুচিত্রা মিত্রকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল—তিনি খবর পেয়েই হাসপাতালে এসে আমার হাত ধরে খুব কান্নাকাটি

করেছিলেন। সুচিত্রা মাঝে মাঝে খুব Sentimental হয়ে পড়েন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একদিন আমায় দেখতে গিয়েছিলেন। মেজর জিতেন লাহিড়ী ও তাঁর স্ত্রী আমায় দেখতে যেতেন। যাঁরা রোজই আমার খবরাখবর করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন—ত্রিবিদ সেন, মায়া সেন, বাণী ঠাকুর ও ঢাকার গায়ক কাদেরী কিব্রিয়া। বিমান ঘোষ তাঁর অফিসের কাজকর্ম সেরে রোজ রাত এগারোটায় হাসপাতালে হাজির হতেন। পাহাড়ী সান্যাল প্রায়ই যেতেন। শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্রও আমায় দেখে এসেছিলেন। তাছাড়া আমার ছোট বোন ললিতা চক্রবর্তী এবং আমার ভাগ্নে ভাগ্নী—যতিশংকর, ভাস্বতী ও পারমিতা —আমার যথেষ্ট সেবাযত্ন করত। এদের সবাইকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার পূর্ববঙ্গের জীবন এবং কেন ম্লেচ্ছ ছিলাম

প্রথমেই—আমার জন্মের প্রায় দেড়শো-দুশো বৎসর পিছনের দিকে চলে যাই। পশ্চিমবঙ্গে রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলতে পারব না। শুনেছি এই ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যেই নাকি মতানৈক্য আছে—কেউ বলেন ১৭৭২ আবার কেউ বলেন ১৭৭৪। তাঁর জন্ম-তারিখ অথবা সন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই—তাঁর সম্বন্ধে কোনো বইও আমি পড়িনি। বাল্যকালে আমার মা-বাবার মুখে তাঁর গল্প শুনতাম; আর একটু বড় হয়ে—আমার কৈশোরে ও যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে আচার্যদের মুখে রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে নানা ধরনের গল্প ও কাহিনী শুনেছি। রামমোহন রায় সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তার একটি তালিকা নিচে দিলাম।

১। তিনি একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন এবং জীবনের শুরু থেকেই নাকি ভারতের শাস্ত্র প্রায় সব আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয়—তিনি নাকি ইচ্ছা করলেই একটি আস্ত পাঁঠার মাংস একলা, একবেলাতেই খেয়ে হজম করতে পারতেন। সুতরাং এই ব্যাপারেও তাঁর ব্যক্তিত্ব যে বিরাট ছিল, স্বীকার করতেই হয়।

২। তাঁর বাল্যকাল থেকে শুরু করে অনেক বৎসর তিনি এদেশের ধর্মশাস্ত্রই ঘেঁটেছিলেন—বিদেশী বিদ্যা শেখেননি।

৩। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা বিদেশী ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সত্যকে খুঁজে বার করবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়েছিলেন।

৪। তখনকার দিনগুলিতে নাকি আমাদের দেশ ছিল নানা-বিভীষিকাময় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। হৃদয়হীন শাস্ত্রানুশাসনের অত্যাচারে সমস্ত মানুষের জীবনে নাকি কোন মনুষ্যত্ববোধ ছিল না। রামমোহন রায়ের মন এই সমস্ত হৃদয়হীন প্রাণহীন শাস্ত্রানুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই কারণে নাকি তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কাও হয়েছিল। কিন্তু তিনি মোটেই শঙ্কিত হননি, বরঞ্চ নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে সত্যকে খুঁজে বার করবার চেষ্টায় কঠিন অধ্যবসায় ও মনোবল নিয়ে কাজ করে যেতে লাগলেন।

৫। শেষ পর্যন্ত নানা শাস্ত্র ঘেঁটে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল খুব সম্ভব ১৮২৮ সনের ৬ই ভাদ্র তারিখে। (এর প্রায় তিরাশী বৎসর পরে ১৯১১ সনের ৩ই ৬ই ভাদ্র তারিখে নাকি আমার জন্ম হয়েছিল)।

এই হল রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমার জ্ঞান।

ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ময়মনসিংহ জেলায়, কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইটনা নামে একটি অখ্যাত গ্রামে একজন ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলে তাঁকে তো একঘরে করা হলই, এমনকি নিজের গ্রাম থেকেও তিনি বিতাড়িত হলেন। তাঁর নাম ছিল কালীকিশোর বিশ্বাস। তিনি আমার পিতামহ। তাঁকে আমার নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কারণ ১৮৯৭ সনে স্টীমার থেকে পদ্মা নদীতে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কালীকিশোরের চার পুত্র—একজনকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি—তাঁর মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্রকিশোর আমার পিতৃদেব। আমার জ্যাঠামশাইয়ের

নাম ছিল হরকিশোর বিশ্বাস এবং কাকার নাম ছিল নগেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস। আমার জন্ম হয়েছিল বরিশাল শহরে আমার মাতামহের বাড়িতে। আমার পিতামাতা ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ শহরে বসবাস করতেন এবং আমার দুটি বোন—একজন আমার চাইতে চার-পাঁচ বৎসরের বড়, আরেকজন চার-পাঁচ বৎসরের ছোট। ওই কিশোরগঞ্জ শহরেই আমার শৈশব বাল্যকাল কেটেছিল। শৈশবের কথা স্পষ্টভাবে আমার কিছুই মনে পড়ে না কিন্তু বাল্যকালেই আমার একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিশোরগঞ্জ শহরের হিন্দু বাসিন্দাদের কাছে আমি ছিলাম—"ম্লেচ্ছ"। বাল্যকালে প্রথম স্কুলে ভর্তি হবার পর ওখানকার হিন্দু ছেলেদের দ্বারা আমি "ম্লেচ্ছ" বলে অভিহিত হতাম—এমনকি প্রথম আমি যে বেঞ্চিতে বসতাম সেই বেঞ্চিতেও কোনো হিন্দু ছেলে বসত না। এই ব্যাপারে আমার পিতৃদেবকে জিজ্ঞেস করেও কোনো সদুত্তর আমি পাইনি। উনি শুধু বলতেন, "ওসব কথায় কান দিস না"। পরে অবশ্য বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি খুব ভালোভাবেই আমার বোধগম্য হয়েছিল। তাই আমার বাল্যকালে কোনো হিন্দুদের বাড়িতে আমি কখনও যেতাম না। সেইসব দিনগুলিতে আমার সঙ্গী ছিল কয়েকটি মুসলমান রাখাল ছেলে এবং ওখানকার আমেরিকান মিশনারীদের ও কয়েকঘর বাঙালী খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের ছেলে-মেয়েরা। ওই শহরে আরো দুটি ব্রাহ্ম পরিবার ছিলেন। তাঁদের একজন আমার পিসতুতো দাদা—স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অন্যজন স্বর্গীয় জগমোহন বীর। জগমোহন বীরের পুত্র শচীন্দ্র-মোহন বীর আমাদের স্কুলের Drawing Teacher ছিলেন। তাঁর বড় মেয়ে সুষমা—তাঁকে হামিদাদি ডাকতাম। শচীন্দ্রমোহন বীরের আরো একটি মেয়ে এবং দুই পুত্র ছিলেন। তাছাড়া

ওই শহরে একজন মুসলমান লেডী ডাক্তার ছিলেন—তাঁর নাম ছিল আলেক্‌উন্নেসা খাতুন—তাঁকে ডাকতাম আলেকদি বলে। এই তিনটি বাড়িতেই আমার যাতায়াত ছিল এবং ওঁরা আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পরে অবশ্য স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়বার দিনগুলিতে কয়েকটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল এবং সেই সব বাড়িতেও আমি যেতাম কারণ সেখানে গান-বাজনার চর্চা হত—ওই সব বাড়ির বড়রাও আমায় খুব আপন করে নিয়েছিলেন তাই সেখানে নিজেকে ম্লেচ্ছ ভাবতে পারতাম না। সেইসব বাড়ির লোকজনদের পরিচয় এবং তাঁদের স্নেহ ভালোবাসার কথা পরে লিখব। আপাতত আমার নিজের বাড়ির একটু পরিচয় দিয়ে নিই।

আমার পিতৃদেব বেশ একটু গোঁড়া ধরনের ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু আমার মা আবার ততটা গোঁড়া ছিলেন না। আমার মায়ের নাম ছিল অবলা—ডাকনাম ছিল 'ঘুঘু'। স্কুলে পড়ার দিনগুলিতে এমনকি কলেজে পড়ার দিনগুলিতেও সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের যেতে দেওয়া হত না; সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরতে হত—এই সব নানা ধরনের কড়া নিয়ম মানতেই হত। বাড়িতে রুটিন মাফিক কাজ হত। যথা: সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রাতঃকৃত্য—কিছু খাওয়া-দাওয়া—তারপর পড়াশোনা—পরে পুকুরে আধঘণ্টা হৈহৈ করে স্নান ও সাঁতার—দুই বোন ও মা বাবার জন্যে বাড়িতেই একটি স্নানের ঘর ছিল—পাশে জলের কুয়ো,—ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া—স্কুল থেকে ফিরে এসে কিছু খেয়ে খেলার মাঠে খেলা—এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফেরা। তারপর সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে সবাই মিলে নানা ধরনে ব্রহ্মসংগীত গাওয়া, ছোটখাটো ব্রহ্মোপাসনা তারপর আবার

পড়াশোনা। সন্ধ্যাবেলা বাবা প্রায় রোজই আমায় পড়াতেন—বিশেষ করে অঙ্ক ও ইংরেজী। ইংরেজী পড়াবার সময়, গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত পুরোটা মুখস্থ না শোনাতে পারলে তিনি কিছুতেই ছাড়তেন না। তিনি সব সময়েই বলতেন যে বিদেশী ভাষা মুখস্থ না করলে নাকি কিছুতেই শেখা যায় না। সেই জন্য তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় কথা বলতেন এবং ওই ভাষাতেই উত্তর দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। রবিবার সন্ধ্যাবেলায় উপাসনার ব্যাপারটি বেশ একটু লম্বা ধরনের হত—এই ব্যাপারটি আমার কাছে খুব একঘেয়ে লাগত কিন্তু উপায় নেই—নিয়ম। আমাদের মা আবার রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' বইটি থেকে কিছু কিছু অংশ আমাদের পড়ে শোনাতেন—কিছুই বোধগম্য হত না—কেন যে ওসব উনি আমাদের পড়ে শোনাতেন তা বুঝতামও না জানতামও না। এইভাবেই বৎসরের পর বৎসর কেটে যেতে লাগল। খেলার মাঠে বড়রা ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলতেন। আমরাও আমাদের একটি ছোট মাঠে ফুটবলের অভাবে বড় বাতাবীলেবু (আমরা বাঙাল দেশে বলতাম জাম্বুরা) দিয়ে ফুটবল খেলতাম। তাছাড়া গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা এবং আরো নানা ধরনের খেলা আমরা খেলতাম। সেই সব খেলাধুলার সময় অবশ্য আমায় কেউ 'ম্লেচ্ছ' বলে ঘৃণা করত না, নিজেকেও 'ম্লেচ্ছ' মনে হত না। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বড়দের সঙ্গেও ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্‌টন ইত্যাদি নানা খেলাই খেলেছি—এই খেলাগুলি কারো কাছে আমাদের শিখতে হয়নি—দেখে দেখেই শিখেছি। গানের বেলাতেও তাই—মাঝি-মাল্লাদের গান, মুসলমান রাখাল ছেলেদের গান, ভিখারীদের গানগুলি আমাদের কানে ও গলায় উঠে যেত। তাছাড়া আমাদের মা তো

সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব সময়েই গুন্‌গুন্‌ করে গাইতেন। বাড়িতে একটি ছোট হারমোনিয়াম ছিল, সেটা বাজিয়ে রোজ সন্ধ্যায় মা ব্রহ্মসংগীতগুলি গাইতেন। শুনতে শুনতে গানগুলি আমার এবং আমার বোনদের গলায় উঠে যেত। আমরাও মায়ের সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় ওই গানগুলি গাইতাম। আমার দিদি—সান্ত্বনা, কিশোরগঞ্জের মাইনর বালিকা বিদ্যালয়ের পড়া সাঙ্গ করে ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী হাই স্কুলে পড়তে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড ঘটে গেল। কোন বৎসরে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আমার পিতৃদেব, কলকাতার ডোয়ার্কিন কোম্পানী থেকে রেল-পার্সেল যোগে একটি নতুন অর্গান কিনে আনিয়েছিলেন। এই অর্গানটি আনাবার পর আমার গানের উৎসাহ বেড়ে গেল।

কী কী গান সেই দিনগুলিতে সাধারণত আমাদের বাড়িতে গাওয়া হত তার একটি তালিকা যতদূর মনে আছে নিচে দিলাম:

১। ভাইবোনে মিলে তব পদতলে
২। বল রে বল রে বল রে বল ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্
৩। তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
৪। হে সখা, মম হৃদয়ে রহো
৫। তোমারে অসীমে প্রাণমন লয়ে
৬। সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
৭। ভুবনেশ্বর হে
৮। নয় নয় এ মধুর খেলা
৯। তোমারি মধুররূপে
১০। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
১১। আজি যত তারা তব আকাশে
১২। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে

১৩। কর তাঁর নাম গান

১৪। গাও হে তাঁহারি নাম

১৫। মোরা সত্যের পরে মন

১৬। ভজরে প্রভু দেব দেব

১৭। অনন্ত অপার তোমায় কে জানে

১৮। ভাব সেই একে

১৯। সীমার মাঝে অসীম তুমি

২০। অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা

২১। আমার মাথা নত করে দাও হে

২২। চির নবীন শিব সুন্দর হে

২৩। তুমি আমাদের পিতা

২৪। প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি

২৫। প্রভু আমার প্রিয় আমার

২৬। প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম

২৭। বন্দি দেব দয়াময় তব চরণে

২৮। ব্রহ্ম নাম বদনেতে বল অবিরাম

২৯। মাগো জননী স্নেহ রূপিণী

এ ছাড়া আরো অনেক ব্রহ্মসংগীত আমার মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছিলাম। সব এখন আর মনে পড়ছে না। ব্রহ্মসংগীত ছাড়াও আরো অনেক গান মায়ের কাছে শুনে শুনে শিখেছিলাম। সব মনে নেই, তবে কয়েকটি কথা মনে আছে :

১। মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি

২। ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে

৩। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

৪। বাদল ধারা হলোঁ সারা ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বড় হয়ে শুনেছি যে আমার মা নাকি আগে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে অনেক গান করতেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরও নাকি ব্রাহ্মদের মুগ্ধ করে রাখত। তিনি কোথায় এত গান শিখেছিলেন তা আমার জানা নেই।

যে গানগুলি আমার মায়ের মুখে শুনে শুনে শিখে তখনকার দিনে গাইতাম সেই গানগুলির রচয়িতার নাম জানবার মতো কোনো আগ্রহ বা ঔৎসুক্য আমাদের ছিল না। প্রায় প্রত্যেক বৎসরে মাঘোৎসবের সময় মা বাবার সঙ্গে আমরা ময়মনসিংহ শহরে যেতাম এবং আমার বড় পিসীমার বাড়িতে উঠতাম। যে এলাকায় বড় পিসীমা থাকতেন সেই এলাকাটাকে বলা হত ব্রাহ্মপল্লী। অনেক ব্রাহ্ম-পরিবার ব্রাহ্মপল্লীতে বাস করতেন--তাদের ইতিহাস ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে হয়তো পাওয়া যাবে। স্কুলে পড়ার দিনগুলিতে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মাঘোৎসবে আমার মায়ের সঙ্গে এবং ওখানকার ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই গান গাইতাম। ওই ব্রাহ্মপল্লীতেই একজনকে খুতুদা বলে ডাকতাম। তিনি তাঁর যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং পরে কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁর নাম পুলিনবিহারী সেন। এখন তাঁকে আর খুতুদা ডাকি না, অন্য সবার মতো পুলিনদা বলেই ডাকি। পুলিনদার কথা অর্থাৎ তাঁর সাহায্যের কথা পরে আবার লিখব।

আমাদের কিশোরগঞ্জের বাড়িটি একটি স্বাস্থ্যনিবাস অথবা মিলন কেন্দ্রের মতো ছিল; কারণ প্রত্যেক গ্রীষ্ম এবং পূজার ছুটিতে আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা এবং অনাত্মীয় পরিচিত ব্রাহ্মরাও আমাদের বাড়িতে এসে ছুটি কাটিয়ে যেতেন। আমার কাকা, কাকীমা, খুড়তুতো

পিসতুতো ভাইবোনেরা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে মহানন্দে ছুটি উপভোগ করতাম। আমার খুড়তুতো ভাইবোন এবং পিসতুতো বোনদের ছেলেমেয়েদের মুখে শুনে কত গান যে আমার গলায় উঠে গিয়েছিল তার হিসেব এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

১৯২৩-২৪ সনে স্কুলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার দিনগুলি থেকেই কয়েকজন হিন্দু সহপাঠী আমায় বেশ আপন করে নিল। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল অমিয় রায়, ডাকনাম ছিল টুনু (সে আর এখন ইহলোকে নেই)। টুনুর গানের গলা খুব মিষ্টি ছিল। টুনুর এক বোন ছিল, নাম রেণু। সেও খুব সুন্দর গাইত। টুনুর বাবা শচীন্দ্র রায় এবং টুনুর দাদা সবাই আমায় খুব আপন করে নিলেন। টুনুর চারজন জ্যাঠামশাই ছিলেন। দুজনকে আমি দেখিনি। ওঁরা সব জমিদার ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁরা কখনোই জমিদারী মানসিকতা নিয়ে কথা বলতেন না। ওই পরিবারটি সম্বন্ধে একটু বিশেষ করে আমার লিখতে হচ্ছে তার কারণ···পরে আমি লিখতে চেষ্টা করব।

টুনুর বাবা ও তার দুই জ্যাঠামশাই রাজেন্দ্রকিশোর রায় ও যোগেন্দ্রকিশোর রায়—তাঁরাও আমায় খুব পছন্দ করতেন। তবে যোগেন্দ্রকিশোর রায় খুব রাসভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন —তাই তাঁর কাছে মোটেই ভিড়তাম না। রাজেন্দ্রকিশোর রায় খুব ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের তখনকার দিনের কয়েকজন নামজাদা ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার একজন সুদর্শন যুবক সরোজরঞ্জন চৌধুরী (এখন জীবিত নেই) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলেন। সরোজ চৌধুরীর আতিথেয়তা ও পরিচর্যায় মুগ্ধ হয়ে তিনি যোগেন্দ্রকিশোর

রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহলতার সঙ্গে সরোজবাবুর বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেইসূত্রে যোগেন্দ্রকিশোর রায়ও শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের পরিবেশ এবং অন্যান্য কাজকর্মের ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোৎস্নালতাকে ১৯২৩-২৪ সনে এবং তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দুভূষণ রায়কে ১৯২৫ সনে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ওখানেই পড়াশোনা করত। ইন্দুর মেজদিদি প্রীতিলতা নিয়োগী বিয়ের কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হয়ে যান। তাঁর দুই বৎসর বয়স্ক পুত্র রানাকে নিয়ে তিনিও ১৯১৮ সনে শান্তিনিকেতন চলে যান এবং সেখানেই পড়াশোনা করেন।

টুনুদের বাড়িতেই নানা ধরনের আধুনিক গান হত, সেসব গানের কথা এখন কিছু মনে নেই তবে দুয়েকটা গানের প্রথম লাইন মনে আছে। যথা: ১। "সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী, এই যে মোদের গোপন মিলন কেউ জানে না আমরা জানি", ২। "বাঁধ না তরীখানি আমারি নদীকূলে", ৩। "ওরে মাঝি, তরী হেথা বেঁধোনাকো" ইত্যাদি। টুনুর দাদারা—ননীদা, মণিদা, লালুদা আমায় খুব স্নেহ করতেন। মণিদা এখন বেঁচে নেই। টুনুর ছোট ভাই ভানু (প্রিয়গোপাল রায়)-ও আমার খুব ভক্ত হয়ে উঠল। আমি যে 'ম্লেচ্ছ' তা ওদের বাড়িতে গেলে আমার মনেই হোত না।

কিশোরগঞ্জে রমণী সাহা নামে এক ভদ্রলোকের একটি সাইকেলের দোকান ছিল। সেই দোকানে আবার তখনকার দিনের চোঙা লাগানো কুকুরের ছবি দেওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবার কলও বিক্রি হত, রেকর্ডও বিক্রি করা হত। তখনকার দিনে ওই সব যন্ত্রকে বলা হত "কলের গানের যন্ত্র"। মাঝে মাঝে রমণীবাবুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নানা ধরনের গান শুনতাম এবং কিছু কিছু গানও

গলায় তুলে নিতাম। তখনকার দিনগুলিতে রেকর্ডের গায়কদের নাম ছিল—কে. মল্লিক, আশ্চর্যময়ী, বেদনা দাসী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা এবং আরও কয়েকজন—তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। ইন্দুবালার গানের শেষে কয়েকটি কথাও রেকর্ড করা থাকতো; তা হল, "মাই নেম ইজ ইন্দুবালা, অ্যামেচার"। ওই ব্যাপারটিতে আমরা খুব মজা পেতাম। তাই ইন্দুবালার রেকর্ডের কোনো গান গেয়েই ওই কথাগুলি আমরাও বলতাম খুব মজা করে। কিন্তু ওই সব গান আমার নিজের বাড়িতে গাইলেই আমার বাবা ও মায়ের কাছে ভীষণ বকুনি খেতাম। ওঁরা বলতেন, "কী ছাতামাতা গান গাস? রবিবাবুর গান গাইতে পারিস না?" তাই টুনুদের বাড়িতে কিংবা আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে একটি সামান্য উঁচু মাঠ ছিল, সেখানেই ওই সব গান গাইতাম।

টুনুর বাড়ি ছাড়াও কয়েকজন অব্রাহ্ম সহপাঠীদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। একজনের নাম ছিল বিনোদ চৌধুরী। ডাকতাম বিনু বলে। বিনু হল স্বনামধন্য নীরোদ সি চৌধুরীর ছোট ভাই। বিনুর মাতাঠাকুরানীও হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাড়িতে রবিবাবুর গান ও নানা ধরনের গান গাইতেন বলে ওখানকার হিন্দু বাসিন্দারা তাঁর বেশ নিন্দা করতেন।

আরেকটি বাড়ির কথা আমার মনে আছে। কোন বৎসর আমার ঠিক মনে পড়ছে না—আমি বোধহয় তখন স্কুলে অষ্টম বা নবম শ্রেণীতে পড়তাম। আমাদের স্কুলের পুরনো হেডমাস্টার রামেশ্বর চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করলেন, তারপর একজন নতুন হেডমাস্টার বা প্রধান শিক্ষক এলেন। তাঁর নাম ছিল নীহার সেন। তাঁর স্ত্রী সান্ত্বনা বৌদি আমায় খুব স্নেহ করতেন। তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে অনেক কিছু আমায় খাওয়াতেন। আমাদের বাড়িতেও তিনি প্রায়ই আসতেন।

আমাদের সেই প্রধান শিক্ষকের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে আসার অনেকদিন পরে। তখন সান্ত্বনা বৌদি তাঁর ছেলেদের এবং একটি মেয়েকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস করতেন। অনেক বৎসর পরে সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতেও আমি দুয়েকবার তাঁর অতিথি হয়েছিলাম।

আমার আরো কয়েকটি অব্রাহ্ম হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও খুব ভালো পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁরা আমায় বেশ স্নেহও করতেন, কিন্তু আমার যাতায়াত ছিল তাঁদের "বাইর-বাড়ী-ঘর" অর্থাৎ বাইরের বৈঠকখানা বা বসবার ঘর পর্যন্ত। তাছাড়া অনেক মুসলমান সহপাঠীদের সঙ্গেও আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরো দুজন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে লিখতেই হয়— যদিও তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অনেক পরে অর্থাৎ ১৯৩১ সনে। তাঁরা দুজনেই কিশোরগঞ্জের মাইনর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। একজনের নাম শৈলজা রায় এবং আরেকজনের নাম কমলিনী দাস। দুজনেই বিধবা এবং অব্রাহ্ম। আমার মা এবং বাবাকে ওঁরা খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রায়ই আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। পুজোর এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন কলকাতা থেকে দেশে যেতাম শৈলজাদি ও কমলদি দুজনে পালা করে প্রায়ই নানা জিনিস রান্না করে ওঁদের রান্নাঘরে বসিয়ে অথবা নিজেদের ঘরে বসিয়ে আমায় খাওয়াতেন। আমি যে 'ম্লেচ্ছ' তা যেন ওঁরা একেবারেই মানতেন না। ওঁদের কাছে যে ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম তা কিশোরগঞ্জের কোনো অব্রাহ্ম হিন্দুদের বাড়িতে (অবশ্যি টুমুদের বাড়ি ছাড়া) আমি পাইনি। ওঁদের ভালোবাসার কথা আমি কখনও ভুলব না। কমলদির কোনো

সন্তান ছিল না। শৈলজাদির চারজন মেয়ে ছিল। শৈলজাদির ছোট মেয়ে মেন্নুকে আমার খুব বুদ্ধিমতী ও মেধাবিনী মনে হয়েছিল। শৈলজাদির এক মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই মারা যায়। মেন্নু তখন স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ত। একদিন ওকে বলেছিলাম, "মেন্নু, তুই যদি একটু মন দিয়ে লেখাপড়া করিস তাহলে তোর মা, যিনি এতো সামান্য মাইনে পেয়েও তোদের কত কষ্ট সহ্য করে লালনপালন করছেন, তাঁর দুঃখ তুই মোচন করতে পারবি। তুই আমায় কথা দে—তুই চেষ্টা করবি।" মেন্নু খুব ভেবেচিন্তে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, "আমি পারব খোকাদা?" কিশোরগঞ্জে আমায় কেউ 'জর্জ' বলত না। বড়রা বলতেন 'দেবু' বা 'খোকা,' আর ছোটরা 'দেবুদা' বা 'খোকাদা'। আমি বললাম 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই নিশ্চয়ই পারবি।' মেন্নু বলল, "খোকাদা, আপনাকে কথা দিলাম।" পরে শুনেছিলাম ১৯৪৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস' নিয়ে মেন্নু এম এ পড়ছে। তারপর ১৯৫৬ সনে পি, এইচ. ডি. হবার পর মেন্নু হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে খবর দিয়ে বলল, "খোকাদা, আপনাকে যা কথা দিয়েছিলাম তা আমি রেখেছি।" মেন্নু এখন ডক্টর অমিতা রায়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকার কাজ করছে। তার বৃদ্ধা মাকে নিজের কাছেই রেখেছে। শুনেছি মেন্নুকে নাকি বক্তৃতা দেবার জন্য মাঝে মাঝে ভারতের বাইরেও যেতে হয়।

আবার স্কুলে পড়ার দিনগুলিতে চলে যাই। সেই সময়ে দেশে স্বাদেশিকতার হাওয়া খুব জোরে বইছিল। কিশোরগঞ্জেও একটি কংগ্রেস কমিটি ছিল। সেই কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নানা স্বদেশী সভা হত। ওখানকার কংগ্রেসের নেতারা বক্তৃতা দিতেন। সেইসব স্বদেশী সভায় গান গাইবার জন্য আমারও ডাক পড়ত। টুনুদের বাড়িতে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর

নাম ছিল মহেন্দ্র রায়। আমাদের চাইতে বয়সে অনেক বড়। তিনি গান গাইতে পারতেন। আমাদের সমবয়সী কয়েকজনকে তিনি "দেশ দেশ নন্দিত করি", "দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে" এবং মুকুন্দ দাসের কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান শিখিয়েছিলেন। আমার অন্তরেও তখন দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল তাই কংগ্রেস-ভলান্টিয়ার হয়ে গেলাম। নানা স্বদেশী সভায় দেশাত্মবোধক গানগুলি গেয়ে মনে হত খুব দারুণ দেশের কাজ করে যাচ্ছি; মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে যেত। আমার পিতৃদেব বোধহয় একটু গন্ধ পেয়েছিলেন; তাই হঠাৎ একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "লেখাপড়া ছেড়ে কি করিস?" বললাম "ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য কংগ্রেসের কাজ করছি।" বাবা বললেন, "বলিস কি রে? ইংরেজদের তাড়াবি কি?" আগেই বলেছি বাবা আমার সঙ্গে সুযোগ পেলেই ইংরেজী ভাষায় কথা বলতেন। তাই তিনি বললেন, "জানিস British Government is a divine dispensation—তোদের দেশে বাপ মরলে মাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত, তোদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো পাপ বলে মনে করা হত, তোদের দেশে ঠগীদের দৌরাত্ম্যে মানুষের জীবনে কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তোদের দেশের লোকেরা খোলা মাঠকে পায়খানা হিসাবে ব্যবহার করত; তোদের সভ্য করে তুলবার উদ্দেশ্যেই ভগবান ইংরেজদের এদেশে পাঠিয়েছেন। ইংরেজরা মিউনিসিপ্যালিটি মারফত তোদের একটু স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে, কিন্তু সব জায়গায় চুরি আর ঠগবাজি চলছে। You are not fit to rule yourselves. তোদের কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডাদের দৌড় দেখলাম তো। এই তো ক মাস আগে সরোজিনী নাইডু এখানে এসেছিলেন। তোদের নেতারা তো

পুলিসের ভয়ে কেউ তাঁকে বাড়ি রাখতে সাহস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমাদের বাড়িতেই রেখেছিলাম। ও সব ছেড়ে দে। ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ালে আবার তোদের সেই আগের দশা হবে।"

বাবার কথা আমার মোটেই মনঃপূত হল না, কিন্তু প্রতিবাদ করবার সাহস তখন ছিল না। ভাবলাম ব্রাহ্মরা তো বিশ্বাস করেন এবং উপাসনার সময় বলেন, "ভগবান মঙ্গলময়---তিনি যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন।" সেই বিশ্বাস থেকেই বোধহয় আমার বাবার ওই রকম ধারণা হয়েছিল। যাই হোক কংগ্রেস ছাড়তে হল আর দেশাত্মবোধক গানগুলি আপাতত শিকেয় তোলা রইল।

আমার মা আবার কিশোরগঞ্জে একটি মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। কোথায় সেই সমিতি হত এবং সেখানে কী ধরনের কাজ হত তাও আমি জানতাম না। কিন্তু এই ব্যাপারে বাবাকে কোনো মন্তব্য বা আপত্তি করতে শুনিনি। তবে আমাদের বাড়িতে একটি তাঁত বসানো হয়েছিল, মা কাছাকাছি গ্রাম থেকে সব দুঃস্থা গরীব মেয়েদের বাড়িতে এনে তাঁদের তাঁতের কাজ শিখিয়ে কী সব ব্যবস্থা করতেন যাতে তাঁরা কিছু রোজগার করতে পারেন। এই ব্যাপারেও বাবা কোনো আপত্তি বা মন্তব্য করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাবার ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তিনি প্রায়ই বলতেন, "জানিস, রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড পেয়েছিলেন ইংরেজদের কাছ থেকে কিন্তু তা তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন। জানিস, রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।" ওই সব পেলে কি হয় আর ফেরত দিলেই বা কি হয় তা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার তখন একেবারেই ছিল না, তাই কিছু বুঝতামও না। আবার তিনি প্রায়ই বলতেন, "রবীন্দ্রনাথ কেন যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মহাত্মা

বলতেন আমি বুঝি না।' বাবার মুখেই শুনেছিলাম গান্ধীজী নাকি রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কী সব কটু মন্তব্য করেছিলেন।

(আমার বাল্যকাল থেকেই কলকাতা থেকে দুটি মাসিক পত্রিকা আমাদের বাড়িতে আনা হত—'সন্দেশ' ও 'মৌচাক'। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজের কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করতেন। সেই পত্রিকাটিও আমাদের বাড়িতে আনা হত। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সঞ্জীবনী') খুব সম্ভব ১৯২৫ অথবা ১৯২৬ সনে, ঠিক সনটি আমার মনে পড়ছে না—একজন ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে রেবা রায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কী একটা সাহায্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নেচেছিলেন। (যে ব্রাহ্মসমাজ একদা হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সেই ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় রেবা রায়ের স্টেজে নৃত্যের তীব্র নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও এসব ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। তখনকার দিনে ভদ্রঘরের মেয়েরা সর্বসাধারণের সামনে নাচ দেখাবে এই ব্যাপারটি উদারপন্থী কলকাতার ব্রাহ্মদেরও বিচলিত করে তুলেছিল। আমার বাবা মা কৃষ্ণকুমার মিত্রের বক্তব্যকে সমর্থন করেন নি। পরে অবশ্য এসব ব্যাপার নিয়ে আর কোনো গোলমাল হয়নি, সমালোচনাও হয়নি।

১৯২৭ সনে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হলাম কারণ কিশোরগঞ্জে তখনো কোনো কলেজ ছিল না। থাকতাম ব্রাহ্মপল্লীতে বড়পিসীমার বাড়িতে।) ইতিমধ্যে কলকাতার সিটি কলেজের রামমোহন হস্টেলের হিন্দু ছাত্ররা বায়না ধরলে হস্টেলে সরস্বতী পুজো করতে দিতে হবে।

কিন্তু সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ হস্টেলে সরস্বতী পুজো করবার অনুমতি দিতে রাজী হলেন না কারণ ওই কলেজের নিয়ম ও সংবিধান অনুসারে ওই ধরনের অনুমতি দেওয়া চলে না। সেই সময়ে কলকাতার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সব হিন্দু ছাত্রদের ওই কলেজ ছেড়ে অন্যান্য কলেজে ভর্তি হবার নির্দেশ দিলেন। ফলে অনেকেই অন্যান্য কলেজে চলে যেতে আরম্ভ করল। সেই সময়ে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে দেশের সব ব্রাহ্ম ছাত্রছাত্রীদের সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে কলেজটিকে টিকিয়ে রাখবার আহ্বান জানান হল।

তখন আমিও ১৯২৭ সনের শেষের দিকে কিংবা ১৯২৮ সনের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ কলেজ থেকে ট্রান্স্ফার নিয়ে কলকাতার সিটি কলেজে (আমহার্স্ট স্ট্রীটে) ভর্তি হলাম এবং ৪৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে অবস্থিত অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে থাকবার জন্য একটি ঘর পেয়ে গেলাম। তখনকার দিনে ঘরভাড়া দুবেলা খাবার এবং একবেলা টিফিনের জন্য খরচ লাগত মাসে একুশ টাকা। বলা বাহুল্য তখনকার দিনের সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম। সিটি কলেজে পড়ার দিনগুলিতে আমার একজন সহপাঠীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল —তার নাম সুধীন্দ্র দত্ত (মহালক্ষ্মী কটন মিলের হেমেন্দ্র দত্তের পুত্র)। সুধীন এখন আর বেঁচে নেই। তবে তার সম্বন্ধে ১৯৪৪ সনের একটি ঘটনার কথা পরে উল্লেখ করব।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য

১৯২৮ সনের গোড়ার দিক থেকেই আমার জীবনের আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। তখন আমার বয়স ষোলো পার হয়ে সতেরোতে পড়েছে। কলকাতার রাস্তা-ঘাট-মাঠ ময়দানের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে লাগলাম। ২১১ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে (এখন বিধান সরণী) অবস্থিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরেও যাতায়াত শুরু হল। যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজে তিনটি ভাগ ছিল। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী ও ভক্তদের সমাজ, (মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে, বর্তমান কেশব সেন স্ট্রীটে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দির) আর যাঁরা বাকী রইলেন, তাঁরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, তাঁদের ব্রহ্মমন্দির ২১১নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। কী কারণে এই সব ভাগাভাগি হয়েছিল তার আলোচনা করার এখন আর প্রয়োজন নেই। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে (ডাঃ রাজেন্দ্র রোডে) আরেকটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তার নাম হল 'ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদের মিলনকেন্দ্র। সেই ব্রহ্মমন্দিরেও আমার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল।

১৯২৮ সনে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষে ৬ই ভাদ্র তারিখে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি বিশেষ

ভাদ্রোৎসব পালনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেদিনের সকাল বেলার উপাসনায় আচার্যের কাজ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে রাজী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বেশ অসুস্থ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এসেছিলেন এবং দেখেছিলাম দুজন ভদ্রলোক ওই দারুণ ভিড়ের মধ্যে তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে বেদীতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ওই ১৯২৮ সনের ৬ই ভাদ্র তারিখে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি তাঁর দুর্বল কণ্ঠস্বরে উপাসনার কাজ করেছিলেন এবং শেষে তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে একটি ব্রহ্মসংগীতও গেয়েছিলেন। কী গান গেয়েছিলেন আমার মনে পড়ছে না। ওই দিন উপাসনার অন্য গান কারা করেছিলেন তাও জানতাম না, কারণ ব্রাহ্মসমাজের গানের দলে তখনও স্থান করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। একে তো আমি সম্পূর্ণ নতুন, তার ওপর নিতান্তই অল্পবয়স্ক।

তবে সেইদিন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি একটি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলাম, কারণ এরকম একটি ঘটনা যে ঘটবে তা ভাবতেও পারিনি।

১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণেরা, ভদ্রঘরের বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে জনসমক্ষে নৃত্য পরিবেশনের অনুষ্ঠান করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছিলেন, এই বিষয়টির উল্লেখ আমি আগেই করেছি। অন্যান্য দু' একটি পত্রিকায়ও এই ধরনের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব সমালোচনাও আমি পড়েছিলাম এবং তাতে আমার মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ৬ই ভাদ্র মন্দিরে গিয়ে খবর পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। তখন আমার মনে হয়েছিল হয়তো অভিমানই আসল কারণ। কিন্তু

যখন দেখলাম তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সত্যি বিস্মিত হয়েছিলাম।

পরে বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি যে কথা লিখেছিলেন—"সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে"—সেই কথা তিনি তাঁর নিজের জীবনেও প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন।

১৯২৯ সনে আই. এ. পরীক্ষা পাস করে বি. এ. ক্লাসে পড়বার জন্য বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলাম। থাকতাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের পিছন দিকে ভুবনমোহন সরকার লেনে একটি মেসবাড়িতে। মেসটির নাম ছিল 'ব্রাহ্ম ইয়ংমেন্‌স হোম'। বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. পড়বার সময় তিনজন গায়কের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ১। শৈলেশ দত্তগুপ্ত, ২। হিমাংশু দত্ত, সুরসাগর, ৩। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনজনই আর এখন ইহলোকে নেই। হিমাংশু দত্ত পড়তেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায়, যতদূর মনে পড়ে, দুই তিন বৎসর তাঁর লেখাপড়ার কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। পরে ১৯৩০ সনে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অর্থাৎ ফোর্থ ইয়ারে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি থাকতেন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেই (বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের কাছে এবং গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড সন্‌সের দোকানের সামনে) একটি বাড়িতে দোতলার একটি ঘরে। হিমাংশুবাবুর ঘরে আমার খুব যাতায়াত ছিল। উনি সত্যিকারের গুণী ছিলেন কারণ তখন থেকেই তিনি নানা গানে সুরারোপ করতেন এবং সেই সুরগুলি একেবারে নতুন ধরনের লাগত। তাঁর গলায় কাজগুলি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং কণ্ঠস্বরও শ্রুতিমধুর। এই ধরনের সুরের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। তিনি সুবোধ পুরকায়স্থ ও অজয়

ভট্টাচার্যের গানের সুর করতেন। তাঁর কাছ থেকে সেইসব গানের অনেকগুলি আমার গলায় তুলে নিয়েছিলাম। উনি খুব যত্ন করে আমায় সূক্ষ্ম কাজগুলি দেখিয়ে দিতেন কিন্তু দিলে কী হবে! আমি তো কখনো গান শিখিনি, এত সূক্ষ্ম কাজ আমার গলায় উঠত না। শৈলেশ দত্তগুপ্ত পরে সুরকার হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। ভীষ্মদেববাবু খুব সম্ভব তখন ওই কলেজে আই. এ. পড়তেন। তিনি তো উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা করতেন, তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় হয়েছিল বটে তবে খুব একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়নি।

১৯৩০ সনের শেষদিকে মার্কাস স্কোয়ারের কাছে বালক দত্ত লেনে একটি নতুন মেসের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। সেখানে আরেকজন গায়ক, সন্তোষ সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমরা এক ঘরেই থাকতাম। সন্তোষ তখন থেকেই নানা ধরনের গান গাইত। আমার এখনও মনে আছে সন্তোষের গলায় সাহানা দেবীর একটি গান—"শ্যামা হো হিয়া না বজাও মুরলীয়া" প্রায়ই শুনতাম। খুব সুন্দর লাগত ওর গলায়।

১৯২৮ সন থেকে শুরু করে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের গাইয়েদের দলে আমার জায়গাটি বেশ পোক্ত হয়ে উঠল। তখনকার দিনে মাঘোৎসবে এবং ভাদ্রোৎসবে মন্দিরে উপাসনার গানের জন্য রীতিমতো বেশ কয়েকদিন ধরে রিহার্সাল হত—রিহার্সালগুলি মন্দিরেও হত, আবার অনেক ব্রাহ্মদের বাড়িতেও হত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এগারোই মাঘ ছিল মাঘোৎসবের বিশেষ দিন—সেই দিন হত দিনব্যাপী উৎসব। আর ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের বিশেষ দিন ছিল এগারোই মাঘের পরের রবিবার। সেখানে বিশেষ উপাসনা হত সকালবেলায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মাঘোৎসব পালিত হত এগারোই মাঘ সন্ধ্যাবেলায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

এবং ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে আরো নানা উৎসব হত—যুব উৎসব, বালকবালিকা উৎসব, গানে উপাসনা ইত্যাদি। এই সব উৎসবের গানগুলি আমরা শিখতাম বড়দের কাছ থেকেই। যাঁদের কাছে শিখতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন গুপ্ত (তাঁকে আমরা ছোট্‌কুদা ডাকতাম) উষারঞ্জন ঘোষ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুবালা আচার্য এবং আরো অনেকেই। তাঁরা কেউ এখন জীবিত নেই। ভবানীপুর মন্দিরের গানের ব্যাপারে উমা দেও অনেক ব্রহ্মসংগীত আমাদের শিখিয়েছিলেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তখনকার দিনে কোনো স্বরলিপির বই সামনে রেখে শেখানো হত না, গাওয়াও হত না। যাঁদের কথা উল্লেখ করলাম, তাঁরা ওইসব ব্রহ্মসংগীত ঠিকমতো গাইছেন কিনা এবং তাঁরা কোথায় এইসব গান শিখেছিলেন,—এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে কখনোই জাগত না। তাঁরা যেভাবে গাইতেন, আমরাও ঠিক সেইভাবেই গাইতাম। ব্রহ্মসংগীত যা গাওয়া হত তা কার বা কাদের রচিত এইসব প্রশ্নও তখন মনে হত না। 'রবীন্দ্রসংগীত' বলে আলাদা কোনো শ্রেণীবিভাগ তখন একেবারেই ছিল না। কিশোরগঞ্জে বাবা মায়ের মুখে, ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদের মুখে এবং কলকাতাতেও মাঝে মাঝে শুনতাম 'রবিবাবুর গান' অথবা 'রবিঠাকুরের গান'। 'রবীন্দ্রসংগীত' এই কথাটির উৎপত্তি কবে হল আমার জানা নেই, তাই বলতেও পারব না।

সেই দিনগুলিতে যাঁদের সঙ্গে মন্দিরে, ব্রাহ্মবিবাহে অথবা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ব্রহ্মসংগীতগুলি গাইতাম তাঁদের নামের তালিকা এখন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, অনেকের নামই এখন ভুলে গিয়েছি। যাঁদের কথা মনে আছে তাঁরা হলেন—সুবালা আচার্য, সুরমা সেন (গজিদি), সুপ্রভা রায় (টুলুমাসী) ধীরেন গুপ্ত, উষারঞ্জন ঘোষ,

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (এদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি), অজয় বিশ্বাস (বলাইদা) এবং অজয় রায়চৌধুরী। তাঁরা এখন কেউ জীবিত নেই। যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন—তাঁরা হলেন উমা দে, কনক বিশ্বাস, সতীদেবী, জয়া দাস, বিজয়া রায়, চিত্রা, গৌরী, কাজল, ইলু, সোমেন গুপ্ত, কল্যাণ চ্যাটার্জি (বাগী) এবং আরো অনেকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই যে তখনকার দিনে মন্দিরে একক সংগীত গাইতে আমি কিছুতেই সাহস পেতাম না। কেন যে এই ভয় হত তা আমি বুঝতাম না, বলতেও পারব না। কিন্তু কোরাস গানগুলিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে গাইতাম। মাঝে মাঝে অন্য গায়কের বা গায়িকার সঙ্গে দ্বৈতসংগীতও আমায় দিয়ে গাওয়ানো হত, তখন মোটেই ভয় হত না।

আমার বড়মামীর নাম ছিল প্রতিভা দত্ত (এখন জীবিতা নেই) --তাঁরও গানের গলা ছিল এবং বেশ জোরালো গলার আওয়াজ ছিল। বড়মামীর দুই বোন ১। সুপ্রভা রায় (সুকুমার রায়ের পত্নী এবং স্বনামধন্য সত্যজিৎ রায়ের মাতা)—তিনিও এখন পরলোকে। তাঁকে ডাকতাম 'টুলুমাসী'—তাঁর গানের গলা ছিল যেমন সুরেলা তেমন মিষ্টি। ২। কনক দাস (১৯৪৩ সনে আমার জ্যাঠতুতো দাদা অজয়কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁকে বিয়ের আগে ডাকতাম 'বুঁচিমাসী', এখন তিনি আমার বৌদি। বুঁচিমাসীর গানের গলায় মিষ্টিত্ব তো ছিলই, আবার 'জোয়ারী' বলে একটি মজার ব্যাপারও ছিল। মনে পড়ে বহু বৎসর আগের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনো একটি উৎসবের দিনে বুঁচিমাসীর সঙ্গে "হে মোর দেবতা" গানটি দ্বৈতভাবে গাইতে হয়েছিল। তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মাইক্রোফোন ব্যবহারের প্রচলন হয়নি। দুজনে তো গানটি

শুরু করলাম। গানটির অন্তরার ভাগে যখন চড়ার দিকে গাইছিলাম ঝুঁচিমাসীর গলার আওয়াজের 'জোয়ারী' শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। আমার গলায় গান বন্ধ হয়ে গেল, চোখ বুজে শুনছিলাম ঝুঁচিমাসীর গান—হঠাৎ তাঁর কনুইএর ধাক্কায় চমকে উঠলাম, আবার তাঁর সঙ্গে গান ধরতে হল, কিন্তু তখন আমি গাইব কি? কোনো মতে গানটি শেষ করলাম।

শুনেছি সাহানাদেবীর মতো টুলুমাসী ও ঝুঁচিমাসীও নাকি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সন্তোষ-কুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের লেখা "কবিকণ্ঠ" নামে একটি বইএর ৪৮ পৃষ্ঠার পরে একটি মজার ব্যাপার দেখেছিলাম। তাতে এম. এল. সাহার দোকান (৫।১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা) থেকে পয়লা জুলাই ১৯১৭ তারিখ দেওয়া একটি কার্ডের ফোটোস্ট্যাট কপি ছাপানো হয়েছে। তাতে দেখলাম অন্যান্য ধরনের (গজল, কীর্তন ইত্যাদি) গানের পাঁচজন গায়ক-গায়িকার রেকর্ডের তালিকার মধ্যে ঝুঁচিমাসী অর্থাৎ কনক দাসের গাওয়া দুটি গানের নাম দেওয়া আছে। রেকর্ডের নম্বর পি-৮৮৫১। গান দুটি হল—১। "কবে তুমি আসবে বলে" ২। "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে"। প্রথম গানটির পরে ব্র্যাকেটে লেখা আছে "অতি উত্তম"। এই গান দুটিকে 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে পরিচিতি দেওয়া হয়নি এবং গান দুটি রবীন্দ্রনাথের রচিত তারও উল্লেখ ছিল না। একটি কথা এখানে লিখতেই হয় যে তখনকার দিনে রুচিসম্পন্ন অবস্থাপন্ন রবীন্দ্র-ভক্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে অন্যান্য রেকর্ডের সঙ্গে সাহানাদেবী, কনক দাস ও সতীদেবীর রেকর্ড বাজতই। আগে নাকি অমলা দাস ও রমা মজুমদারের রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড ছিল কিন্তু সেই সব রেকর্ড শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

আমার বড়মামী প্রতিভা দত্তের চার ভাই। ছোট একটি ভাইকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি কারণ আমার কলকাতায় আসবার আগেই বোধ হয় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যাঁদের দেখেছি তাঁরা হলেন ১। চারুচন্দ্র দাস—পাটনায় ব্যারিস্টার ছিলেন। ২। সুধীন্দ্র দাস—লখনউএ ব্যারিস্টার ছিলেন, অবসর গ্রহণ করে এখন কলকাতায় আছেন। ৩। প্রশান্তকুমার দাস—কলকাতায় Empirc of India Insurance কোম্পানীতে কাজ করতেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন, থাকতেন প্রথমে বকুলবাগান রোডে, পরে বেলতলা রোডে ১৯৩৬ সনে বালীগঞ্জে তিনকোনা পার্কের কাছে নিজেই একটি বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন।

প্রশান্তকুমার দাসকে আমি "টুটুমামা" ডাকতাম এবং এখনও তাই ডাকি। ওই টুটুমামার বাড়িটি ছিল নানা ধরনের রুচিসম্মত গানের আখড়া বা কেন্দ্র। কলেজে পড়ার দিনগুলিতে রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষজ্ঞ অনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল টুটুমামার বেলতলার বাড়িতেই। বুঁচিমাসী টুটুমামার বাড়িতেই থাকতেন। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর টুলুমাসী ও তাঁর একমাত্র পুত্র (মানিক বা সত্যজিৎ রায়) এবং চারুমামার ১৯৩১ সনে মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মাধুরীমামী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শ্যালিকা) তাঁর দুই কন্যা জয়া, বিজয়া (মণি, মঙ্কু)-কে নিয়ে টুটুমামার বাড়িতেই থাকতেন। মাধুরীমামীর বড় দুই কন্যার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একজন গৌরীদেবী আরেকজন সতীদেবী। সতীদেবীর সঙ্গে চেনা হয়েছিল টুটুমামার বাড়িতেই। তাঁকে মেজদি ডাকি। মেজদির মেয়ে রুমা গুহঠাকুরতা।

১৯২৮ থেকে শুরু করে বহু বৎসর ব্রহ্মমন্দিরে এবং বহু ব্রাহ্ম-বিবাহ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গান গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য

রচয়িতাদের ব্রহ্মসংগীতের সুরের মাধুর্যে আমি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, যদিও উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা আমি কোনো কালেই করিনি। কিন্তু তাই বলে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহ কোনো কালেই হয়নি। গান গাইতে আনন্দ পেতাম তাই গাইতাম। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ ও নবীনদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা এই গানের জন্যই আমি পেয়েছিলাম। তাছাড়া অনেক আধুনিক গান হিমাংশু দত্তের সুর দেওয়া গান, কুমার শচীন দেববর্মণের গান, কে. এল. সাইগলের গান এবং আরো অনেক গানও আমি ছাত্রজীবনে গাইতাম।

আগেই উল্লেখ করেছি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মাঘোৎসব হত ১১ মাঘ সন্ধ্যাবেলায়। তখনকার দিনে ওই মাঘোৎসবে যেতে হলে প্রবেশপত্র লাগত। প্রায় দেড় ইঞ্চি চওড়া এবং আড়াই ইঞ্চি লম্বা হলদে রঙের কার্ড (নিমন্ত্রণ-পত্র) আগের থেকেই ওখানে গিয়ে যোগাড় করে ফেলতাম। আরেক রকম রঙের কার্ডও ছিল। সেগুলি বোধহয় মাননীয় ব্যক্তিদের দেওয়া হত। দুয়েক বৎসর পরে ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবের গানের রিহার্সাল শুনতে প্রায়ই ঠাকুরবাড়ি যেতাম এবং দূরে বসেই শুনতাম। ওখানকার উৎসবগুলিতে তখন কারা গাইতেন আমার ঠিক মনে পড়ছে না—অনেককে চিনতামও না।

শান্তিনিকেতন—প্রথম দেখলাম

১৯২৮ সন থেকে ১৯৩৩ সন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই অর্থাৎ কলেজে পড়ার দিনগুলিতে গরমের ও পুজোর ছুটিতে দেশে কিশোরগঞ্জে যেতেই হত, কারণ আমার বাবা মা খুব আশা করে থাকতেন। ১৯৩৪ সনে চাকরি নেবার পর শুধু পুজোর ছুটিগুলিতেই দেশে যেতাম। ছুটির দিনগুলিতে প্রায়ই আমাদের গানের আড্ডা বসত. হয় টুনুদের (যার কথা আগে বলেছি) বাড়িতে, না হয় আমাদের বাড়ির কাছেই একটি উঁচু মাঠে। আমাদের দলে একজন ছিলেন তাঁর নাম সুনীল মজুমদার (এখন জীবিত নেই), তিনি নানা কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর আবৃত্তি করার একটি বিশেষ কায়দা ছিল। কোনো পঙ্‌ক্তি জোর দিয়ে বলবার সময় তিনি শব্দগুলি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে বলতেন; "শক্তি দিঁয়াছে, প্রেরণা দিয়াঁছে বিঁজয় লঁক্ষ্মী নারী।" এই ব্যাপারটি আমরা খুব মজা করে উপভোগ করতাম। টুনুর এক জ্যাঠ্‌তুতো ভাই ইন্দুভূষণ রায়, যার কথা আগে উল্লেখ করেছি, সে শান্তিনিকেতনেই পড়াশোনা করত। ছুটিগুলিতে সেও দেশে আসত। শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে থেকে ওর মানসিকতা যেভাবে গড়ে উঠেছিল সেই মানসিকতা নিয়ে কিশোরগঞ্জে ওর সমবয়সীদের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে বা খাপ খাইয়ে চলতে পারত না। তাই সে আমাদের কাছে চলে আসত। যদিও ইন্দু আমার চাইতে ছয়-সাত বৎসরের ছোট তবুও

ওকে আমাদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলাম। ওর ডাকনাম ছিল গোপাল। আমাদের দেশের ভাষায় ওকে ডাকতাম 'গুপাল'। গোপাল দেশে এলেই ওকে শান্তিনিকেতনের গান শোনাতে বলতাম এবং ওর মতো করে সে শোনাত। মনে পড়ে সে একবার একটি নতুন গান শোনাল—গানটি রবীন্দ্রনাথের নয়, শান্তিনিকেতনের সুধীরচন্দ্র করের। গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল "কে যায় রে দূরের পথ দিয়া, বনের পথে আবছা লাগায় দেখি না দেখিয়া ওরে কে যায়রে"। গান শেষ হবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গুপাল, আব্‌ছালা গায় দিয়া তো কেউ গেল, কিন্তু আব্‌ছালাটা কি জিনিস রে?" গোপাল তো আমার কথা শুনে চুপ করেই ছিল। আমাদের দলে মাঝে মাঝে আমাদের চাইতে বয়সে বড় এক ভদ্রলোকও আসতেন, তাঁকে আমরা নগেনদা বলতাম। নগেনদা হঠাৎ বলে উঠলেন, "আব্‌ছালা জানো না? আব্‌ছালা হল বালাপোষ জাতীয় একটি জিনিস। আমরা সবাই মুখ গম্ভীর করে শুনলাম। তারপর হঠাৎ যখন নগেনদা চলে গেলেন তখন আমাদের হাসির ফোয়ারা আর থামে না। এখনও পুরনো দিনের কথা যখনই হয় এবং সেখানে যদি ইন্দুভূষণ থাকে—তাহলে "আব্‌ছালা"র গপ্পোটি নিয়ে আমরা খুব মজা করি।

শান্তিনিকেতনের স্কুলপড়ুয়া ছাত্র ইন্দুভূষণ রায়ের কথা, তার পিতৃদেব এবং দিদিদের কথা আমি আগে একবার উল্লেখ করেছি। এইভাবে ইন্দুর নাম এত বিশেষ করে বার বার উল্লেখ করার একটি সবিশেষ কারণ আছে। এই ইন্দুভূষণের কাছেই আমি শান্তিনিকেতনের পৌষোৎসব, পৌষমেলা, বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল এবং ভরসামঙ্গল জাতীয় নানা উৎসবের নানা গল্প শুনতাম। ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং বড় হয়ে শুধু মাঘোৎসব আর ভাদ্রোৎসবের

কথাই জানতাম। শান্তিনিকেতনের এই উৎসবগুলির সম্বন্ধে আমার তখন কোনো ধারণাই ছিল না। ইন্দুভূষণের মুখে শান্তিনিকেতনের ওই উৎসবগুলির গল্প ও বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনে খুব ঔৎসুক্য জেগেছিল। তাই খুব সম্ভব ১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ ৬ই পৌষ সন্ধ্যায় আমার জীবনে প্রথমবার শান্তিনিকেতনে হাজির হলাম। ইন্দু তখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, সে তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তার বন্ধুদের নাম—অনুপানন্দ ভট্টাচার্য (জগদানন্দ রায়ের দৌহিত্র), গোরা বসু (শিল্পী নন্দলাল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র—সে জীবিত নেই), রঞ্জিত রায় (ওর দিদি রেবা রায়ের নৃত্য নিয়ে কলকাতার ব্রাহ্ম-সমাজে খুব হৈচৈ হয়েছিল—রঞ্জিতও এখন জীবিত নেই), সুকুমার সরকার এবং আরো কয়েকজন যাদের নাম এখন মনে পড়ছে না। ইন্দু এবং তার বন্ধুরা আমার খাওয়া-দাওয়া এবং রাত্তিরে ঘুমোবার ব্যবস্থা সব করে দিল। ইতিমধ্যেই মেলা জমতে শুরু করেছে। অনেক ছোট ছোট দোকানপাট বানিয়ে নানা জিনিসপত্র সাজানো হচ্ছে। তখনকার দিনে মেলাটি বসত যে জায়গায় সেই জায়গাটি যাঁরা আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন। যাঁরা আগে যাননি এবং হালে যেতে শুরু করেছেন তাঁদের বোঝাবার জন্যই একটু লিখে জানাচ্ছি। ওখানে পুরনো গেস্ট হাউসের সামনে এবং মন্দিরের পাশেই একটি সিংহদ্বারের মতো গেট আছে—যার ওপরে লোহার ফ্রেমে কতকগুলি বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত কথা লেখা আছে। সেই সিংহদ্বার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের একটি বাসভবন 'উত্তরায়ণ' পর্যন্ত একটি ফাঁকা মাঠ ছিল। সেই মাঠেই মেলা বসতো। অনেক বৎসর পর মেলার জায়গা অন্য আর একটি মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সেই যে ১৯৩১ সনে প্রথম শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম তার পর থেকে প্রত্যেক বৎসর শান্তিনিকেতনের পৌষোৎসবে এবং বসন্তোৎসবে যাওয়ার ব্যাপারটি একটি নেশার মতো হয়ে গেল। শুধু আমি নই, অনেক পরিচিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গেও সেখানে দেখা হত। কয়েকবার বর্ষামঙ্গল উৎসবেও গিয়েছিলাম। একবার ১৯৩৩ সালে (সেবার ইন্দু ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছে) ইন্দু আর তার বন্ধুরা মিলে খুব সম্ভব কলাভবন হলে কিংবা অন্য কোনো একটি ঘরে আমার গানের আসর বসিয়ে দিল। তখন শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন হেমেন্দ্রলাল রায়। তিনিও সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন আমি সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য রচিত হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের সুরারোপিত বেশ কয়েকটি গান এবং খুব সম্ভব কয়েকটি শচীন দেববর্মণের গানও গেয়েছিলাম। সেই অনুষ্ঠানের শেষে অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রলাল রায় আমার হাত ধরে হিমাংশু দত্তের সুরারোপিত গানগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই আমার মায়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গানগুলি শুনতেই আমার কান অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কলকাতার ব্রহ্মমন্দিরগুলিতে এবং ব্রাহ্মবিবাহের ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানগুলিতে যে সব ব্রহ্মসংগীত আমরা গাইতাম সেই সব ব্রহ্মসংগীতের অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রনাথের। সেই সব আধ্যাত্মিক গানগুলির সুরের মধ্যে কী যেন একটা মাধুর্য ছিল যা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত গভীরভাবে নাড়া দিত, যদিও সংগীত সম্বন্ধে আমার তখন কোনো ধরনের জ্ঞান ছিল না। তাই ১৯৩১ সন থেকে আরম্ভ করে বেশ কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতনে গিয়ে যেসব গান (আধ্যাত্মিক নয়) ওখানকার ছেলে-মেয়েদের মুখে ও গলায় শুনতাম, সেই গানগুলির সুর এবং গাইবার ধরন-ধারন আমার মনকে একেবারেই আকৃষ্ট করত না। এর কারণ

দু রকমের হতে পারে। এক নম্বর কারণ হতে পারে যে, ওই গান-গুলির রস গ্রহণ বা উপভোগ করার ব্যাপারে আমার নিজের অক্ষমতা কিংবা দু নম্বর কারণ হতে পারে এই যে যাদের মুখে ও গলায় ওই সব গান শুনতাম, গানের মধ্যে রস সঞ্চারণে তাদের অক্ষমতা। আবার এই কথাটিও সত্যি যে তখনকার দিনে সংগীতরসিকরা এবং সাধারণ শ্রোতারাও রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গান এবং ঋতু-সংগীতগুলিকেও যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন না। এই সব গানগুলির প্রতি তাদের রীতিমতো অশ্রদ্ধাই ছিল।

বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মমন্দিরগুলিতে ও ব্রাহ্মদের অনুষ্ঠানগুলিতে আমি আধ্যাত্মিক গান গাইতাম। কিন্তু তাই বলে আমার মনে বা হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতা কোনোদিন বাসা বাঁধতে পারেনি। আধ্যাত্মিকতত্ত্ব কিছুই বুঝতাম না এবং এখনও বুঝি না। তখনকাব দিনে যাঁরা মন্দিরের বেদীতে বসে আচার্যের কাজ অর্থাৎ উপাসনার কাজ করতেন তাঁরা জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন—তাঁরা এখন সবাই পবলোকে। সেই সব আচার্যদের কাছেও আমি ভিড়তাম না। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯২৮ সনে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের বেদীতে উপাসনার কাজ করতে। তাই তাঁকেও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবেই ধরে নিয়েছিলাম। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ সকালে ওখানকার মন্দিরে উপাসনা হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই ওখানে উপাসনার কাজ করতেন। দূরে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তাঁর কথা শুনতাম। যে কারণে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদের কাছে ভিড়তাম না, ঠিক সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের কাছেও ভিড়তাম না। অকপটে স্বীকার করতে আমার কোনোই সঙ্কোচ নেই যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সামান্য একটু ধারণাও তখনকার দিনে আমার ছিল না, বুঝবার মতো বুদ্ধিও ছিল না।

যাই হোক শান্তিনিকেতনে বেশ কয়েকবার যাতায়াতের ফলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন আত্মীয় এবং ওখানকার অনেক নামকরা ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পুলিনদা অর্থাৎ পুলিন-বিহারী সেনকে তো বাল্যকাল থেকেই চিনতাম। পুলিনদার কয়েকজন বন্ধু, যথা: নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল সরকার, ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন এবং আরো অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

গায়ক হব স্বপ্নেও ভাবিনি

১৯৩৩ সনে অর্থনীতিশাস্ত্রে কোনোমতে এম. এ. পরীক্ষা পাস করে ১৯৩৪ সনে বিনা মাইনেতে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানীতে চাকরিতে ঢুকে পড়লাম। ১৯৩৫ সনে মে মাসে পাকা খাতায় নাম উঠল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। সেই দিনগুলিতে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানী ছিল এলিট সিনেমার উলটো দিকে একটি দালানে—নাম ছিল হিন্দুস্থান বিল্‌ডিং। সেই সময় টিউশনি করে খরচ চালাতাম—থাকতাম ভবানীপুরে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডে আমার এক বন্ধু রঞ্জিত চৌধুরীর বাড়িতে। সেই সময়ে আমার দেশের ছেলে ইন্দুভূষণ রায় শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে আই এ পড়তে কলকাতায় এল—থাকতো আমার সঙ্গেই। পরে ভবানীপুর থানার উলটো দিকে একটি মেসবাড়িতে আমরা উঠলাম। সেই মেসে আমার জ্যাঠতুতো দাদা অজয় বিশ্বাস থাকতেন। পরে ইন্দু তার মেজদি ও মেজদির পুত্র রানাকে নিয়ে বালীগঞ্জে কেয়াতলা রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করল এবং আমায় সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে কয়েক মাস থেকে আমি হিন্দুস্থান বিল্‌ডিঙের পিছনে সমবায় ম্যানসন্‌সে একটি মেসে গিয়ে উঠলাম —১৯৩৫ সনেই।

সেই দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি

আগে ওই হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার বহু বৎসর আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কোম্পানী তাঁর জন্য একটি মাসিক পেন্‌সনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পরেও তিনি রোজই অফিসে আসতেন এবং তাঁর জন্য ওই অফিসের চারতলায় একটি ঘরের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে তিনি রোজই এসে অনেক কিছু লেখালেখির কাজ করতেন। ইতিমধ্যে ইংরেজী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের খবরও আমি জেনেছিলাম। বহু বৎসর আগেকার অর্থাৎ প্রায় ১৯১৪-১৫-১৬ সনের পুরনো সব ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের লেখা তখনকার দিনের অনেক রকমের অফিসিয়াল চিঠিগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে আমার একটি খাতায় লিখে ফেলেছিলাম। অফিসের কাজে আমায় যেসব চিঠি লিখতে হত, সেই সব চিঠিতে সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের চিঠির বিষয়বস্তুর মিল থাকলেই তাঁর লেখার কয়েকটি ইংরেজী কথা আমার চিঠিতেও লাগিয়ে দিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে আমার চিঠিগুলি একটু শুদ্ধ করে দিতে অনুরোধ করতাম। তিনি আমার অনুরোধ রাখতেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, "এ সব চিঠিতে খুব চেনা গন্ধ পাচ্ছি—এ সব তুমি কোথায় পেলে?" তখন আমি তাঁর পুরনো চিঠিগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার খাতায় তুলে রাখবার খবরটি বলেছিলাম। আমার কথা শুনে তিনি খুব অবাক হয়ে যেতেন আবার খুশীও হতেন। এইভাবেই তাঁর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। তাঁর পুত্র সুবীর ঠাকুরও হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানীতে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গেও আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সুবীরবাবুর সঙ্গেই ওঁদের পাম অ্যাভিনিউএর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পিসীমা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর সঙ্গে পরিচিত হবার অসীম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তারপর থেকে অনেকবার আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়েছি এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গান নয় এমন অনেক গান শিখিয়ে আমায় নানা অনুষ্ঠানে গাওয়াতেন। "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী" গানটি তিনি গাওয়াতেন পাশ্চাত্য কায়দায় হারমোনাইজ করে। আমাকে দিয়ে, তিনি নিচের দিকের সুরগুলি গাওয়াতেন কারণ আমার গলার আওয়াজ বেশ মোটা এবং ভারী ধরনের ছিল বলে। তিনি নিজেই পিয়ানো বাজিয়ে এবং নিজেই গেয়ে গানগুলি কী ভাবে গাইতে হবে দেখিয়ে দিতেন। পিয়ানো বাজাতেন একেবারে পাশ্চাত্য কায়দায়। পার্কসার্কাসে 'সঙ্গীত সম্মিলনী' নামে মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত একটি সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই প্রতিষ্ঠানে নানাধরনের গান শেখানো হত। ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীর পরিচালনায় সেই সংগীত প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমাকে গাওয়ানো হয়েছিল। সেই দিনগুলি থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও নানা পর্যায়ের গানগুলির রসে আমি মজা পেতে লাগলাম। তখনকার দিনে 'স্বরবিতান' নামের কোনো স্বরলিপি বইএর নাম শুনিনি। স্বরলিপি বুঝতামও না। আমার কোনো পরিচিত স্নেহশীল ব্যক্তি কাঙালীচরণ সেন প্রণীত কয়েকখণ্ড পুরানো ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপির বই আমায় উপহার দিয়েছিলেন কিন্তু কে যে দিয়েছিলেন আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। যাই হোক ওই বইগুলি পড়ে পড়ে স্বরলিপি বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিছু টাকা জমিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত চারটি খণ্ড 'স্বরলিপি-গীতমালা' এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্বরলিপি লিখিত 'গীতলিপির' একটি খণ্ড কিনে ফেলেছিলাম। বইগুলির দামও তখন খুব কম ছিল। যখনই সময় পেতাম স্বরলিপি দেখে নিজেই গাইবার চেষ্টা করতাম। 'গীতলিপি'র ছয়টি খণ্ড ছিল কিন্তু একটি খণ্ডই পেয়েছিলাম।

১৯৩৫ সনের পর থেকে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ছাড়াও আরো অনেকগুলি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল, সেই ঘটনাগুলির সন বা তারিখ আমার কিছুই মনে নেই। কবে কী ঘটেছে তাও ঠিক ঠিক বলা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয় কারণ স্মৃতিশক্তি এখন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঘটনাগুলি সংক্ষেপে :

১। কবে মনে নেই, আমার সহপাঠী সন্তোষ সেনগুপ্ত আমায় 'সেনোলা' রেকর্ড কোম্পানীতে নিয়ে গিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে এবং তাঁর সহকারী চিত্ত রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম আমার গান শুনে দুটি গান শিখিয়ে সেনোলা কোম্পানীর হয়ে আমায় দিয়ে গান দুটি রেকর্ড করিয়েছিলেন। একটি গান ছিল—"মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধো বাদ", আরেকটি গানের কথা আমি ভুলে গিয়েছি। রেকর্ডটি কী কারণে প্রকাশ করা হল না তাও আমার মনে নেই।

২। ১৯৩৬ সনে প্রশান্তকুমার দাস (টুটুমামা) বালীগঞ্জে তিন-কোনা পার্কের পাশে তাঁদের নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন। টুটুমামার বাড়িতে কারা কারা থাকতেন এবং তাঁর বাড়িটি যে একটি গানের কেন্দ্র ছিল তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

টুটুমামার নতুন বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। ওই বাড়িতেই উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী তারাপদ চক্রবর্তী এবং কুন্দনলাল সাইগলের গান শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল কিন্তু অনাদিদার সঙ্গে আমার পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল টুটুমামার বালীগঞ্জের বাড়িতেই। সেই বাড়িতে হিমাংশু দত্ত সুরসাগর প্রায়ই আসতেন এবং নানাধরনের নতুন গানও শোনাতেন। হিজ মাস্টারস ভয়েস

কোম্পানীর একজন পদস্থ অফিসার হেম সোম মহাশয়ের সঙ্গে ওই বাড়িতেই আমার পরিচয় হয়েছিল।

৩। কোন সনে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আমায় নিজেই নিয়ে গিয়ে Garstine place-এ অবস্থিত কলকাতা বেতারকেন্দ্রে আমায় গান গাইবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তখন Station Director ছিলেন নৃপেন্দ্র মজুমদার।

৪। ১৯৩৮ সনে আমার বড় বোনের বিয়ে হয় এবং বিয়ের তুদিন পরেই আমার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। তারপর আমার মাতৃদেবী এবং ছোট ভগ্নীকে নিয়ে বালীগঞ্জে কবীর রোডে পাঁচিশ টাকা ভাড়ায় তুটি ঘরওয়ালা বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করি।

৫। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে, কোন বৎসরে আমার মনে পড়ছে না, কিংবা চল্লিশের দশকের প্রথম দিকেও হতে পারে—হেম সোম মহাশয় কনক দাসের সঙ্গে আমায় নিয়ে—একটি দ্বৈতসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করেছিলেন। সেইটি আমার প্রথম রেকর্ড। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের। তুটি গানই রবীন্দ্রনাথের—একটি হল, "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান" এবং আরেকটি, "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব"। এইচ এম ভি কোম্পানীতে রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কিছুকাল পরে হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ড কোম্পানী কনক দাসের এবং আমার আরেকটি দ্বৈতসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করেছিলেন। সেই গান তুটিও রবীন্দ্রনাথের রচিত:

"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো" এবং "ওই ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে"।

৬। কবীর রোডের বাড়িতে যখন ছিলাম তখন থেকেই হেমন্ত

মুখোপাধ্যায় দ্বিজেন চৌধুরী সমরেশ রায় অজিত চ্যাটার্জি পরিমল সেন এবং আরো অনেকের সঙ্গেই খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সন্তোষ সেনগুপ্ত ওই কবীর রোডের বাড়িতেই নীহারবিন্দু সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নীহারদার রচিত এবং সুরারোপিত কয়েকটি আধুনিক গানও আমি কলকাতা বেতারকেন্দ্রে একবার গেয়েছিলাম।

৭। সেই সময়ে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় একটি ফিল্মের কোরাস গানের মোটা গলার আওয়াজের জন্য দ্বিজেন চৌধুরী আমায় ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভীষ্মদেববাবু আমায় দেখেই চিনতে পারলেন। তাঁর সংগীত পরিচালনায় আরো দুয়েকটি ফিল্মে আমায় তিনি গাইয়েছিলেন। তখন শচীন দেববর্মণ ভীষ্মদেববাবুর সহকারী সংগীত পরিচালক ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তিনি পরে নিজেই সংগীত পরিচালক হয়ে আমায় কয়েকটি ফিল্মে কোরাস গান গাইয়েছিলেন। সেই দিনগুলিতে সুপ্রভা সরকার (তাঁকে বড়দি ডাকি) এবং শৈল-দেবীর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল।

৮। ইতিমধ্যে স্বরলিপি বোঝা এবং স্বরলিপি দেখে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার অভ্যাসটিতে বেশ পোক্ত হয়ে উঠলাম। বাড়িতে একটি ছোট হারমোনিয়াম ছিল, অবসর পেলেই সেটা নিয়ে নানা গান গলায় তুলে ফেলতাম। প্রাইভেট টিউশনির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ অফিসের মাইনে খুব সামান্য ছিল।

বাঁয়ের রাস্তা

১৯৩৮ সন থেকে আমার মনটি বেশ বাঁয়ে হেলে চলতে শুরু করল। কিন্তু তখনকার দিনে ইংরেজ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করে রেখেছিল, তাই গোপনে কাজ করতে হত। সেই গোপনীয় কাজগুলির কথা গোপনেই থাক তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের অফিসের সহকর্মী চিন্মোহন সেহানবীশের খুব সাহায্য পেয়েছিলাম, তা স্বীকার করতেই হয়।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় থেকেই নানাধরনের সঙ্ঘের উৎপত্তি হতে লাগল। ইয়ুথ কাল্‌চারাল ইনস্টিটিউট, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ইত্যাদি। ওই সঙ্ঘের আমন্ত্রণে ওইসব সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলিতে, নানাধরনের স্বদেশী গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলিও গাইতাম।

১৯৪০ সনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রফুল্ল মহলানবীশ (বুলাদা) 'গীতালী' নাম দিয়ে একটি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন গড়ে তুললেন। সেই বৎসরেই 'বিচিত্রা' হলঘরে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল। সেই অনুষ্ঠানে তখনকার দিনের ব্রাহ্ম রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকাদের দলে বুলাদা আমাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই 'গীতালী' কয়-বৎসর টিকেছিল আমার জানা নেই।

১৯৪১ সনে সাতই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ) তারিখে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করলেন। সেই বৎসরেই ৯ই ডিসেম্বর তারিখে

কলকাতায় 'গীতবিতান' শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হল ; উদ্বোধন করে-ছিলেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। শিক্ষকতার কাজ করতেন অনাদিকুমার দস্তিদার, কনক দাস (এখন বিশ্বাস)। এই 'গীতবিতানে'র কত অনুষ্ঠানে যে আমায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার জন্য ডাকা হত তার হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—এক কথায় অসংখ্য। পরে অনেকেই সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার কাজে লেগে গিয়েছিলেন।

১৯৪২ সনে কবীর রোডের বাড়ি ছেড়ে আমি আমার মা এবং ছোট বোনকে নিয়ে ১৭৪ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে একটি বাড়িতে উঠে এলাম এবং এখনো সেখানেই আছি।

১৯৪২ সনের পয়লা আগস্ট তারিখে ইংরেজ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বেআইনী আদেশ তুলে দিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টি উঠে যাবার বেশ কয়েকদিন পর বিলেত-ফেরত আমার কয়েকজন বামপন্থী বন্ধু (আমার চাইতে বয়সে তাঁরা ছোট ছিলেন) আমায় একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি রবীন্দ্রসংগীত গাই কেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রসংগীত নাকি একঘেয়ে প্যানপ্যানানি প্রাণহীন সব গান। তখনো ইয়োরোপে যুদ্ধ চলছে। সেই দিনগুলিতে আরো অনেক সমিতির জন্ম হয়েছিল—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি, আরো নানা নামধারী সমিতি, যেগুলির নাম এখন মনে পড়ছে না। সেইসময়ে খুব সম্ভব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে একটি গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমাকেও অংশগ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং ওখানে গাইতে রাজীও হয়েছিলাম। আমার সেই বিলেত-ফেরত বামপন্থী বন্ধুদের সেই অনুষ্ঠানে যেতে বলেছিলাম এবং তাঁরা গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের

শেষে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁদের এতকাল ভুল ধারণা ছিল।

সেদিন আরেকটি যুবকের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানের শেষে এসে নিজেই তার পরিচয় দিয়ে বলল, তার নাম হেমাঙ্গ বিশ্বাস। শ্রীহট্ট জেলায় তার দেশ। তার নিজের দেশে এবং অন্যান্য অঞ্চলে নানা রবীন্দ্রসংগীত শুনেছে ও শিখেছে—কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে যে এত প্রাণ তা সে আগে কখনো শোনেনি, জানতও না। হেমাঙ্গ বলল, 'জর্জদা, রবীন্দ্রসংগীত যেভাবে আপনি গাইলেন সেইভাবে যে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায় তা আগে ভাবতেও পারিনি।' হেমাঙ্গের কথা শুনে খুব খুশী ও আনন্দিত হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম হেমাঙ্গ নিজে গান লেখে এবং সুরও করে। ওর কথা পরে আবার লিখব।

তখনকার দিনে ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটের একটি বাড়ির চারতলায় একটি ঘরে বামপন্থীদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল। ওখানে আমি সময় পেলে প্রায়ই যেতাম। আমার ধারণা ছিল যে আমার নিজের গলার আওয়াজ বেশ বাজখাঁই ধরনের ছিল কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেখানে আরেকটি যুবকের গান শুনে। তার নাম বিনয় রায়। রংপুরের ছেলে—আমার চাইতে সে বয়সে ছোট ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সে নিজে গান লিখত এবং তাতে নিজেই সুরারোপ করতো। তার গলার আওয়াজ ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, গান গাইবার ভঙ্গীও ছিল অপূর্ব। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের নানা আখড়ায় আরেকজন যুবকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার নাম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—সে কবিতাও লিখত অসাধারণ। তার সঙ্গেও আমার প্রায়ই দেখা হত ৪৬নং ধর্মতলার বাড়িতে। ওই বাড়ির চারতলার ঘরটিতে অনেক নামজাদা বামপন্থী ইন্‌টেলেক্‌-

চুয়ালদের সঙ্গেও পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁরা আমায় যথেষ্ট ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। কিন্তু আমি তাঁদের কাছে বেশি ভিড়তাম না—ভিড়তে সাহসও পেতাম না। কারণ আমার মধ্যে সামান্য ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালিজম্ তখনও ছিল না, এখনও নেই।

১৯৪৩ সনের ঠিক কোন মাসে আমার মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টিকংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময়ে কলকাতা থেকে একটি বামপন্থী সাংস্কৃতিক দলও ট্রেনে করে বোম্বাই রওনা হল। সেই দলে আমিও ছিলাম। আমরা সব তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে যাচ্ছিলাম। সেই কামরাতেই দেখলাম আমাদের ময়মনসিংহের রাজার ছেলে স্নেহাংশু আচার্যও আমাদের সঙ্গে হৈহৈ করে চলেছেন। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও সেই কামরাতে ছিলেন। বোম্বাই শহরে আমাদের দলের নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠান হয়েছিল।

বোম্বাই থেকে ফিরে এসে গণনাট্য সঙ্ঘ নিয়ে খুব মেতে উঠলাম। গণচেতনা উদ্বুদ্ধ করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা শহরে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে গণনাট্যের গান এবং রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলি গাইতাম।

১৯৪৩ সনে সারা বাংলাদেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেল। আমাদের কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র হঠাৎ একদিন আমায় এসে বলল, "এই ছাখ্ কী লিখেছি।" দেখলাম বেশ কয়েকটি গান—দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধে লেখা। তখনই আমার ঘরে গানগুলিতে সুর লাগাতে আরম্ভ করে দিলাম। কয়েকদিন রোজ সকালে জ্যোতিরিন্দ্র আমার কাছে আসত, দেখতে দেখতে অনেক গানের সুর দেওয়া হয়ে গেল। পরে সে নিজেই তার বাড়িতে বাকি গানগুলিতে সুরারোপ

করে আমায় শোনাত এবং প্রয়োজন বোধে বদলে দেওয়াও হত। গানগুলির নামকরণ করল—'নবজীবনের গান'। সেই গানগুলি বহু অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতাম দল বেঁধে।

তারপরে আমাদের বিজন ভট্টাচার্য একটি নতুন নাটক লিখে সবাইকে নিয়ে নেমে পড়লেন সেই নাটকটির অভিনয় দেখাতে—নাটকটির নাম 'নবান্ন'। এতে নানা ভূমিকায় অভিনয় করতেন বিজন নিজে, তাছাড়া গোপাল হালদার, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি ভাতুড়ী (এখন মিত্র) শোভা সেন, অনু দাশগুপ্ত, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হরিপদ কুশারী, রবীন্দ্র মজুমদার এবং আরো অনেকেই। এই নাটকটি যাঁরা তখন দেখেছিলেন তাঁরাই শুধু বলতে পারবেন বিজন কী বিপুল আলোড়ন জাগিয়েছিলেন নাট্যজগতে। নাটক যে ওই রকম একটি রূপ নিতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

খুবই তুঃখের বিষয় আজ জ্যোতিরিন্দ্র ও বিজন তুজনই আর ইহজগতে নেই।

উদয়শঙ্করের ছায়া নাটকের সাফল্য দেখে আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরাও সেই কায়দায় একটি ছায়া নাটক তৈরী করে ফেলে ছিলেন। ছায়া নাটকটির নাম ছিল—'শহীদের ডাক'। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে বহু অঞ্চলে এই ছায়া নাটকটি অনুষ্ঠিত হত। কলকাতার গণনাট্য সঙ্ঘের সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করতেন। ওদের গানের দলে আমিও থাকতাম। এই গণনাট্য সঙ্ঘের ইতিহাস হয় তো অনেকেই লিখেছেন অথবা লিখবেন। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি বইয়ে গণনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁর বইটির নাম হল "তরী হতে তীর"। সেই দিনগুলিতে অনেক প্রতিভাবান শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(তাঁকে আমরা সবাই মহর্ষি বলেই ডাকতাম) হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (তিনি ছিলেন আমাদের হারীনদা) পণ্ডিত রবিশঙ্কর (বিশ্ববিখ্যাত সেতারশিল্পী) ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন ও বোম্বাই এর পৃথ্বিরাজ কাপুর, বলরাজ সাহানীর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

হারীনদা তাঁর নিজের রচিত এবং সুরারোপিত কয়েকটি হিন্দী ভাষায় লেখা গান আমাদের শিখিয়েছেন। গানগুলি ছিল—১। সুরইয়া অস্ত্ হো গয়া, গগন মস্ত্ হো গয়া, ২। অব্ নভমে পতাকা নাচত হ্যায়, ৩। হাম্ মছলী পকড়্ নেওয়ালে।

এই গানগুলি আমরা আই পি টি এ-র অনেক অনুষ্ঠানে গেয়েছি। তখনকার দিনগুলি থেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক হেমন্ত মুখার্জিও আমাদের গানের দলের সঙ্গে এই গানগুলি গাইতেন। তাছাড়া আরো বাংলা গণনাট্যের গানও আমাদের ছিল। সুচিত্রা মিত্র (মুখোপাধ্যায়) তাঁর শান্তিনিকেতনের গান-শেখা-পালা সাঙ্গ করে আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এই কয় বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম পর্যায়ের গানগুলি ছাড়া অন্যান্য গানগুলির রসের স্বাদ আমি পেতে শুরু করেছিলাম। ১৯৪১ সনে কলকাতায় 'গীতবিতান' সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মের পর থেকে তার প্রায় সব অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করার জন্য আমার ডাক পড়ত। গীতবিতানের অনুষ্ঠানগুলি তখন হত আশুতোষ কলেজের একটি 'হল' ঘরে আর ছোট ছোট অনুষ্ঠানগুলি হত চৌরঙ্গী টেরাসে যতীন মজুমদারের বাড়িতে। অনাদিদার পরিচালনাতেই অনুষ্ঠানগুলি হত এবং তাঁর কাছ থেকে শুনে শুনে গানগুলি তুলে নিতাম। তা ছাড়া স্বরলিপি পড়ে গান গলায় তুলে নিতেও তখন আমি পোক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

(আগেই একবার উল্লেখ করেছি যে ১৯৩১ সন থেকে শুরু করে প্রত্যেক বৎসরে শান্তিনিকেতন পৌষোৎসব ও বসন্তোৎসবগুলিতে যাওয়া আমার একটি নেশার মতো হয়েছিল। কোন বৎসরগুলিতে আমার মনে পড়ছে না, শান্তিনিকেতনের পৌষোৎসবগুলিতে গিয়েই পুলিনদাকে (পুলিনবিহারী সেনকে) ওখানকার লাইব্রেরী থেকে পুরনো 'আনন্দসংগীত পত্রিকা' ও 'বীণাবাদিনী পত্রিকা'গুলি আনিয়ে দিতে অনুরোধ করতাম। পুলিনদা সেই বাঁধানো পত্রিকা-গুলি আমার জন্যে গ্রন্থবিভাগের বাড়িতে, তিনি যে ঘরে গিয়ে থাকতেন, সেই ঘরে আনিয়ে রাখতেন। আমি প্রায় রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত জেগে ওই সব পত্রিকায় বহু বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিগুলি আমার খাতায় লিখে নিতাম। এই গভীর রাত্তিরেও পৌষোৎসবের মেলা খুব জোর চলত--কোনো জায়গায় যাত্রাগানের আসর, কোনো জায়গায় বাউলদের গানের আসর চলছে, আবার কোনো কোনো জায়গায় পাশের গ্রামাঞ্চল থেকে এসে সাঁওতালী মেয়েরা অর্ধচন্দ্রাকারে পরস্পরের কোমর ধরে নাচছে, আর ছেলেরা মাদল বাজাচ্ছে, ছোট ছোট দোকানগুলিতেও বেচাকেনা চলছে।

মন্দিরের পাশেই গেটের একধারে ওখানকার বিখ্যাত কালোর চায়ের দোকান। মেলায় একটু ঘুরে কালোর সেই চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। আমায় কিছু বলতে হত না। কালো আমায় দেখেই এক পেয়ালা গরম চা এনে একগাল হাসিমুখে আমার সামনে রেখে যেত। ওর হাসির কারণ ছিল। কারণ পরেই কী ঘটনাটি ঘটবে সে জানত। রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী বুড়ী (নন্দিতা কৃপালনী) বা অন্য কেউ আমায় কালোর দোকানে দেখতে পেলেই চীৎকার করে হাঁক দিতে শুরু করত, "জর্জ এসেছে, জর্জ এসেছে।" ব্যস্, কয়েক

মিনিটের মধ্যেই কালোর দোকান ভরতি হয়ে উঠত চেনা-মুখের লোকে। তারপর আরম্ভ হয়ে যেত গানের আসর। প্রথমে আমার একলার গান, তারপর কোরাস গান সবাই মিলে। কালোর দোকানের সামনেও ভিড় জমে যেত। বুলাদা (প্রফুল্ল মহলানবীশ) পকেট থেকে বাঁশী বার করে গানের সঙ্গে বাজিয়ে যেতেন এবং শচীনদা (শচীন কর) টেবিল বাজিয়ে তবলার কাজ চালিয়ে যেতেন। অনেকক্ষণ ধরে চলত ওই আসর। আবার পরের রাত্তিরেও একই ধরনের আসর বসত। এইভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুরনো 'আনন্দসংগীত পত্রিকা' ও 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত সব রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি আমার খাতায় লেখা হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় ফিরেই গানগুলির স্বরলিপি দেখে দেখে যতগুলি পারতাম সব নিজের গলায় তুলে নিতাম।

ইতিমধ্যে নিউ থিয়েটার্সের কয়েকটি ফিল্মের কোরাস গানের জন্য পঙ্কজদা (পঙ্কজকুমার মল্লিক) আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই পঙ্কজদা আমায় খুব স্নেহ করতেন। তিনি আমায় 'সম্রাট' বলেও ডাকতেন আবার 'মিস্টার ট্রাস্‌ট্' বলেও ডাকতেন। পঙ্কজদার কাছ থেকে একটি হিন্দী গান শিখেছিলাম। গানটি কোনো ফিল্মের কিনা আমার মনে পড়ছে না। গানের প্রথম কয়েকটি কথা ছিল— "করবঁটে বদলতা হুয়া জমানা, একদিন আনেওয়ালা হ্যায়।" এই গানটি আমি আই পি টি-এর কোনো অনুষ্ঠান যখন হিন্দী ভাষা-ভাষী লোকদের অঞ্চলে হত তখনই গাইতাম। সেই সময় থেকে রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার সিটি কলেজে পড়ার দিনগুলিতে আমার একজন সহপাঠী সুধীন দত্তের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এবার তার সম্বন্ধে একটি গল্প

লিখতে হচ্ছে। সুধীন তার কয়েকজন চেনা-পরিচিত বন্ধুদের নিয়ে ঠিক করল কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। ব্যাপারটি হয়েছিল ১৯৪৪ সনে। নয় রাত্রি ধরে কলকাতার তিনটি প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করা হবে। সুধীন আমায় রাজপুত্রের গানগুলি গেয়ে দেবার জন্য পাকড়াও করল—রাজীও হয়ে গেলাম। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল—রিহার্সালও বিজয় সিং নাহারের বাড়িতে কুমার সিং হলে শুরু হয়ে গেল।

তাসের দেশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন :

রাজাসাহেব—সরোজরঞ্জন চৌধুরী

রাণীবিবি—উত্তরাদেবী

সওদাগর পুত্র—সুজন ঠাকুর

ছক্কা—শ্যাম লাহা

পঞ্জা—সাগরময় ঘোষ

তিরি—রঞ্জিত রায়

দুরি—সুজিত ঠাকুর

সম্পাদক—ইন্দুভূষণ রায়

দহলা পণ্ডিত—প্রশান্ত রায়

রুহিতন—সুধীন দত্ত

হরতনী—সংযুক্তা সেন

টেক্কাকুমারীগণ—সরস্বতী শাস্ত্রী, রাণী রায়, গীতা রায়, বাণী বোস, মঞ্জুলা দত্ত, মঞ্জু সেন, বিভা নাহার

নৃত্য পরিচালক—কেলু নায়ার

গানে—রাজেশ্বরী দত্ত, উমা চ্যাটার্জি, সন্তোষ সেনগুপ্ত, আব্দুল আহাদ, সুধীন চ্যাটার্জি, কল্যাণ চ্যাটার্জি, আব্দুল লতিফ

সংগীত পরিচালনা—শান্তিদেব ঘোষ।

গানের দলে আমিও ছিলাম এবং রাজপুত্রের গানগুলি আমাকে গাইতে হত। দু তিন রাত অভিনয় হয়ে যাবার পর পরিচালক মহাশয় নাটকের শেষ গানটি আমায় গাইতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "গানটি With pleasure গাইব, না without pleasure গাইব?" তিনি with pleasure গাইবার নির্দেশ দিলেন। নাটকের শেষ গানটি ছিল "ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও ভাঙো।" তখনকার দিনে গানটি কারা গাইতেন আমার একদম মনে নেই; কিন্তু গানটি গাওয়া হত খুব পেলব ভঙ্গীতে। সেদিন আমি আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলিতে যেভাবে গানটি গাইতাম ঠিক সেই ভঙ্গীতে দ্রুতলয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম। দেখতে পেলাম দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী কেলু নায়ার প্রাণের আনন্দে স্টেজের ধুলো উড়িয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন কিন্তু অন্যরা ঠিক সুবিধে করতে পারছেন না। গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা পতন। তারপরেই ভর্ৎসনার সুরে আমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হল ওইভাবে আমি গানটি গাইলাম কেন। আমি বলেছিলাম আমায় w th pleasure গাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলেই ওইভাবে গেয়েছি। বলা বাহুল্য ওই গান পরে আর আমায় গাইতে হয়নি।

আগেই উল্লেখ করেছি এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানী চারটি রবীন্দ্রসংগীত কনক দাসের সঙ্গে ডুয়েট গানের রেকর্ড, প্রকাশ করেছিলেন। পরে ওই কোম্পানীর আরেকটি শাখা—কলাম্বিয়া রেকর্ডের লেবেলে আমার আরো কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করেছিলেন। সেই গানগুলি ছিল—৫। এ শুধু অলস মায়া, ৬। আজ আকাশ পানে তুলে মাথা, ৭। আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী, ৮। দিন পরে যায় দিন, ৯। এমনি করেই যায়

যদি দিন যাক না, ১০। চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে, ১১। তুমি রবে নীরবে, ১২। ওগো পথের সাথী নমি বারম্বার। "তুমি রবে নীরবে" গানটি অনাদিদা প্রথমে অনুমোদন করতে রাজী হলেন না। তিনি আমায় ডেকে বললেন, গীতবিতানে গানের কথা লেখা আছে—মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন, এই সফল কথাটি তুমি সকল গাইলে কেন?" আমি তখন অনাদিদাকে বললাম 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় যে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে কথাটি 'সকল' আছে। অনাদিদা বললেন, "ওটাতে ভুল হয়েছিল"; আমি বললাম, "ভুল যদি হয়েই থাকত তাহলে এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই শুদ্ধিপত্র বার করা হত—কিন্তু তাতো করা হয়নি।" তবুও অনাদিদা গানটি অনুমোদন করতে রাজী হলেন না। নীহারবিন্দু সেন ইতিমধ্যে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে এই ব্যাপারে তাঁর মতামত চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি উত্তর লিখেছিলেন, "আমার স্মৃতি ও যুক্তি ইহাই সাক্ষ্য দেয়' অর্থাৎ সকল কথাটিই ঠিক। আমি তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বললাম। তাঁদের নির্দেশে পরে অবশ্য অনাদিদা গানটি অনুমোদন করেছিলেন।

তারপরে গীতা সেনের সঙ্গে দ্বৈতসংগীতের একটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। গান দুটি ছিল—১৩। অনেক দিনের শূন্যতা মোর ১৪। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানী তাদের কলাম্বিয়া লেবেলে আমার আরো কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করেছিলেন। গানগুলি হল—১৫। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে, ১৬। সকালবেলার আলোয় বাজে, ১৭। এখন আমার সময় হল, ১৮। এইতো ভালো লেগেছিল, ১৯। ঐ আসন তলের মাটির পরে, ২০। আকাশ জুড়ে

শুনিনু। এই গানগুলি কোন কোন বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোন রেকর্ড কার পরিচালনায় হয়েছিল, আমার মনে পড়ছে না— মনে করে রাখা সম্ভবও নয় কারণ সেই গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল চল্লিশের দশকে। এই গানগুলির রেকর্ড প্রকাশিত হবার পর এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানীর একজন পদস্থ অফিসার আমায় আধুনিক গান রেকর্ড করবার নির্দেশ দিলেন—কারণ হিসাবে উনি জানালেন যে রবীন্দ্রসংগীত আশানুরূপভাবে বাজারে চলছে না। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না তাই ওই কোম্পানীতে রেকর্ড করা বন্ধ করতে হল। প্রায় দশ বৎসর পর হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী আমায় রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার সুযোগ করে দিলেন। তার বৃত্তান্ত পরে যথা সময়ে উল্লেখ করব।

এই দশ বারো বৎসরের মধ্যে একবার সন্তোষ সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে এইচ এম ভি রেকর্ডিং কোম্পানীতে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' রেকর্ড করার সময় অর্জুনের গানের প্রথম দিকের কয়েকটি লাইন—"অহো কি দুঃসহ স্পর্ধা" থেকে আরম্ভ করে "অহো কি অদ্ভুত কৌতুক" পর্যন্ত রেকর্ড করে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আর এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

গ্রামোফোন রেকর্ডের কাজ বন্ধ ছিল বটে কিন্তু আই পি টি এ-র অর্থাৎ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কাজ পুরোদমে চলছিল। ইতিমধ্যে আমাদের দলের সলিল চৌধুরী কয়েকটি কবিতায় সুরারোপ করেছিল। সেইগুলির মধ্যে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের দুটি কবিতা "অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি" এবং "বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে" আমরা সবাই মিলে নানা বামপন্থী

সভায় এবং গণনাট্যের অনুষ্ঠানগুলিতে গাইতাম এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড সাড়া পেতাম।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার এবং কলকাতার বাইরেও দুয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীতানুষ্ঠানে আমায় যেতে হত। তবে আজকালকার মতো পাড়ায় পাড়ায় এত রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠান তখন হত না। 'গীতবিতান' শিক্ষায়তনের নানা অনুষ্ঠান প্রত্যেক বৎসরেই হত—অনেক অনুষ্ঠানে আমার ডাক পড়ত। তা ছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে পঁচিশে বৈশাখ সকালে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করা হত—এখনও হয়। প্রত্যেক বৎসরেই আমার ডাক পড়ত সেখানে গান গাইবার জন্য-আমি যেতাম—কিন্তু আজকাল আর যাই না।

এইভাবেই দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ১৯৪৬ সনের আগস্ট মাসে কলকাতায় শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। কত নিরীহ লোক যে তখন প্রাণ হারাল তার কোনো হিসেব নেই। সেই সময়ে কয়েক মাসের জন্য শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি আমার বাড়িতে আমার পাশের ঘরেই থাকত। আমাদের অফিসের একজন বিশেষ পরিচিত বীরেন দে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে বিপন্ন অঞ্চল থেকে এনে আমার বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য রেখে দিলাম। আমার মা ও ছোট বোনও দোতলায় একটি ঘরে থাকতেন। দাঙ্গা যখন পুরোদমে চলছিল, হঠাৎ আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের একজন গায়ক—কলিম শরাফী (মুসলমান) কলকাতার বাইরের কোনো অঞ্চল থেকে আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। সে জানতই না যে কলকাতায় নারকীয় কাণ্ড চলছে। কলিমকে আমার ঘরেই লুকিয়ে রাখলাম। কয়েকদিন পর শহরের অবস্থার একটু উন্নতি হলে, করিম শরাফীকে একটি গান্ধী টুপী মাথায় পরিয়ে বাসে করে নিয়ে ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে কাকাবাবুর

অর্থাৎ কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের হাতে সঁপে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

তার কয়েক দিন পর আমার মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়। ঠিক সেই দিনগুলিতে শম্ভু মিত্রও তার পিতৃবিয়োগের খবর পেল।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার বেশ কিছু দিন পরে আমাদের হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে ৪নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ নতুন হিন্দুস্থান বিল্ডিঙে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দাঙ্গার পর আবার যথারীতি অফিসে যাতায়াত শুরু হল কিন্তু তখনও দাঙ্গার জের কাটেনি। মাঝে মাঝে ওই অফিসের কাছাকাছি অঞ্চলে হঠাৎ অতর্কিতে আক্রমণের ও খুনোখুনির ব্যাপার ঘটে যেত। মনটাও খুব দমে গিয়েছিল। তাই সেবারে (১৯৪৬ সনে) পুজোর ছুটির সঙ্গে আরো কয়েকদিনের ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে কার্শিয়াঙ চলে গেলাম। কার্শিয়াঙে আমাদের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জায়গাজমি এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল, তাঁর নাম শচীন্দ্র সিংহ—ময়মনসিংহের লোক। তিনি থাকতেন কার্শিয়াঙে 'পেলিকান' নাম দেওয়া একটি বাড়িতে। তিনিও বামপন্থী ছিলেন। তৃপ্তি মিত্রের এক দিদির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কার্শিয়াঙ গেলে শচীনদার বাড়িতেই আমি উঠতাম। খুব সম্ভব শম্ভু তৃপ্তিও সেবারে কার্শিয়াঙ গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক দার্জিলিঙ থেকে স্নেহাংশু আচার্যের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে কার্শিয়াঙে দেখা করলেন। স্নেহাংশুবাবুর কথা আমি আগেই একবার উল্লেখ করেছি ১৯৪৩ সনে পার্টি কংগ্রেস বোম্বাই যাবার দিনে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে আমাদের সঙ্গে যাবার কাহিনীতে। সেই দিনগুলি থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে আমি 'রাজা-

সাহেব' ডাকতাম আর তিনি আমায় 'কর্তা' বলে সম্বোধন করতেন। স্নেহাংশুবাবুর ডাকনাম 'দোদো'। স্নেহাংশুবাবু তাঁর চিঠিতে আমায় জানিয়েছিলেন যে শিলিগুড়ি কমিউনিস্ট পার্টির আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। শিলিগুড়ির কমরেডরা তাঁকে এই অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন। স্নেহাংশুবাবু তাঁর চিঠিতে শিলিগুড়িতে একটি সংগীতানুষ্ঠান করে কিছু অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবার জন্য আমায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই দিনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা নানা কারণে বেশ একটু বেকায়দায় ছিল। তাই আমি স্নেহাংশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে তিনি যদি তাঁর পকেটে একটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শিলিগুড়িতে মঞ্চে গান গাইবার সময় আমার পাশে বসে পাহারা দেন, তা হলেই আমি সেখানে ওই ধরনের গানের অনুষ্ঠানে গান গাইতে যেতে পারব। তিনি রাজী হয়েছিলেন এবং নির্ধারিত দিনে তিনি তাঁর শ্যালিকা সুচিত্রাকে নিয়ে দার্জিলিঙ থেকে এসে আমায় কার্শিয়াঙ থেকে তুলে শিলিগুড়ি নিয়ে গেলেন। আমাদের গান গাইবার সময় স্নেহাংশুবাবু পকেটে একটি অস্ত্র নিয়ে মঞ্চে সারাক্ষণ আমাদের পাশেই বসেছিলেন। বলা বাহুল্য সেদিন সন্ধ্যায় নির্ভয়ে এবং পরমানন্দে অনেক রবীন্দ্রসংগীত ও গণনাট্যের গান গেয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের পর রাত্তিরে স্নেহাংশুবাবুর একটু বাঘশিকার করার শখ হয়েছিল। শিলিগুড়ি থেকে লোকজন বন্দুক ও গাড়ি যোগাড় করে সুচিত্রা আর আমায় নিয়ে কালিমপঙ যাবার রাস্তায় অনেক ঘোরাঘুরি করলেন কিন্তু বাঘের দেখা পাওয়া গেল না।

পরের দিন আমায় কার্শিয়াঙ নামিয়ে দিয়ে ওঁরা দার্জিলিঙ ফিরে গেলেন। আমি পরে গৌহাটী শিলঙ বেড়িয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

১৯৪৬ সনের দাঙ্গার পর মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আগস্ট মাস থেকে শুরু করে কলকাতার বুকে অশান্তি লেগেই ছিল। একমাত্র শান্তি ছিল আমার ঘরে—১৭৪ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউএ। কারণ ১৯৪২ সন থেকে আরম্ভ করে, প্রায়ই সকালে ও সন্ধ্যায় আমার একতলার ঘরে জমত গানের আসর আর আড্ডা। হেমন্ত মুখার্জি সমরেশ রায় অজিত চ্যাটার্জি পরিমল সেন এবং আরো অনেকে এসে হৈচৈ করে নানা ধরনের গান হাস্যকৌতুক ইত্যাদি ব্যাপার করে মহানন্দে ওই সময়টুকু কাটিয়ে দিতেন। আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের ছেলেমেয়েরাও আমার ঘরে এসে সঙ্ঘের অনেক কাজ করে যেত। দাঙ্গার পরেও হেমন্তরা সবাই আমার ঘরে এসে আড্ডা দিয়ে যেত।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ হয়ে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে গেল ১৫ই আগস্ট তারিখে। ১৪ই আগস্ট বিকালবেলা থেকেই দেখতে পেলাম রাস্তায় হাটে মাঠে হিন্দু মুসলমানের কোলাকুলি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন জানালেন। ওদের নতুন থিসিস হল "Support Nehru Govt"। আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের নেতারা অর্থাৎ নিরঞ্জন সেন, বিনয় রায় এবং আরো কয়েকজন আমার ঘরে এল ওদের ভবিষ্যতের কাজকর্ম ব্যাপারে আমার মতামত জানতে। আগেও ওরা নানা বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতে আসত। কিন্তু সেবার ওদের কিছু পরামর্শ দিতে পারলাম না। তাদের আমি বলেছিলাম যে পূর্ববঙ্গের মাটিতে আমার জন্ম হয়েছিল, যে পূর্ববঙ্গে আমি শিশুকাল থেকে বড় হয়েছি, যে পূর্ববঙ্গে আমার নিজের ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন রয়েছে সেই পূর্ববঙ্গ এখন আর আমার স্বদেশ নয়—তা হয়ে গেল বিদেশ—এতে আমার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই কারণে আমাদের

এই স্বাধীনতা যে আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল সেটাই ওদের জানিয়েছিলাম। তাছাড়া যে সব কারণে কমিউনিস্ট পার্টির "Support Nehru Govt." থিসিস আমার কাছে নিতান্তই অযৌক্তিক মনে হয়েছিল তাও ওদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা কী বুঝেছিল জানি না।

১৯৪৭ সনে 'গীতবিতান' রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন থেকে নেমন্তন্ন পেলাম ওদের রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে অভিনয় করার জন্য। সেই অভিনয় দুই সন্ধ্যায় হয়েছিল ১৯৪৭ সনের ৬ই এবং ৭ই অক্টোবর তারিখে 'কালিকা' সিনেমা হলে। তাতে 'বিশুপাগলের' ভূমিকায় আমায় অভিনয় এবং গান করতে হয়েছিল। যাঁরা তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সবার নাম আমার মনে নেই—তবে 'নন্দিনী' হয়েছিলেন উমা চ্যাটার্জি, 'অধ্যাপক'—আমাদের অফিসের এক সহকর্মী নবেন্দু চৌধুরী এবং নীহারবিন্দু সেন—'ফাগুলাল'।

সেই বৎসরেই খুব সম্ভব শেষদিকে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, বামপন্থী মহিলাদের কোনো একটি সমিতির অনুরোধে, তাদের সাহায্যকল্পে কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি 'রক্তকরবী' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলাম। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল—শ্রীরঙ্গম (বর্তমান বিশ্বরূপা) মঞ্চে। তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন শম্ভু মিত্র—রাজা, কণিকা মজুমদার নন্দিনী, তৃপ্তি মিত্র—চন্দ্রা, নবেন্দু চৌধুরী-অধ্যাপক, কালী ব্যানার্জি—সর্দার, সজল রায়চৌধুরী—গোঁসাই এবং কয়েকজন ট্রাম-শ্রমিক শ্রমিকদের ভূমিকায়। নিজে সেজে গেলাম বিশুপাগল। মঞ্চে রাজাকে আড়াল করে রাখবার জন্য মঞ্চের পিছনে একটি মস্ত বড় জাল টাঙিয়ে তার ওপরে আরো নানা কায়দা করে একটি ছোট ঘর বানানো হয়েছিল। এই সব কাজ করেছিলেন শিল্পী সূর্য রায় এবং খালেদ চৌধুরী।

সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে গণনাট্য সঙ্ঘের একটি সম্মিলন হয়েছিল আহমেদাবাদ শহরে— আমাদের বাংলাদেশের আই পি টি এ-র সঙ্গে আমারও সেখানে যেতে হয়েছিল। ওখানে অন্যান্য গানের সঙ্গে "করবটে বদলতে হুয়া জমানা একদিন আনেওয়ালা হ্যায়" এই গানটিও গেয়েছিলাম। শ্রোতাদের অনুরোধে আমায় রোজই দুবার করে ঐ গানটি গাইতে হত। কন্‌ফারেন্‌স-এর শেষে সবাই বোম্বাই ফিরে এলাম। বোম্বাই ফিরে এসে জানা গেল পয়লা জানুআরি ১৯৪৮ থেকে রেলভাড়া অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমাদের পকেটে যা টাকা ছিল সব ঝেড়েঝুড়ে বার করে আই পি টি এ-র পুরো দলটির জন্য কোনোমতে বাড়তি রেলভাড়া যা লেগেছিল তা দিয়ে সবাইকে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হল। নিরঞ্জন সেন বিনয় রায় এবং আমি বোম্বাই থেকে গেলাম। পরে একদিন একটি গানের ছোট অনুষ্ঠান করে বিনয় ও আমি গান গাইলাম। গাইবার পর কে একজন মনে পড়ছে না, আমাদের রেল-ভাড়ার ব্যাপারে বিপদের কথা উল্লেখ করে সবাইকে সাহায্য করবার অনুরোধ জানালেন। সামনেই একটি বড় কাঁসার থালা রাখা ছিল। শ্রোতারা সবাই যে যা পারেন ওই থালার ওপর রেখে গেলেন। এই ভিক্ষার ব্যাপারটি দেখে আমার খুব হাসি পেয়েছিল কিন্তু উপায় নেই। আমাদের তিনজনের কলকাতা যাবার রেলভাড়া উঠে গেল।

সেই সময় বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টির একটি গোপন মিটিং হয়েছিল। খবর পেয়ে পার্টির তখনকার সেক্রেটারী পি. সি. জোশীর অনুমতি নিয়ে সেই সভায় হাজির হলাম। পি. সি. জোশীর সঙ্গে আমার ১৯৪৩ সনেই পরিচয় হয়েছিল—তাই অনুমতি পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। ওখানে গিয়ে দেখি বিনয় এবং নিরঞ্জনও সেখানে বসে আছে। খুব সম্ভব বি. টি. রণদিভে সেই সভায় বক্তৃতা

দিলেন। তিনি Support Nehru Govt. থিসিস্‌টি যে ভুল তা প্রমাণ করার জন্য নানা মার্কসীয় দর্শনশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন এবং কাউকে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে শুনলাম না। কমরেড রণদিভে যখন তাঁর কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন তখন দেখলাম বিনয় ও নিরঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সেদিন থেকে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পথও বদলালেন।

কলকাতা ফিরে আসবার কয়েকদিন পর হেমাঙ্গ বিশ্বাস তার লেখা ও সুর দেওয়া একটি গান শোনাল। ওর কাছ থেকে গান আমার গলায় তুলে নিলাম। তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নানা মিটিঙে গানটি গাইতাম। বিশেষ করে কলকাতার ময়দানের মিটিঙে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সামনে যখন গানটি গাইতাম, তখন শ্রোতাদের বিপুল আনন্দ এবং হর্ষধ্বনি, যাঁরা সেই সব সভায় কখনো যান নি তাঁদের বোধগম্য হবে না। গানটির প্রথম কয়েকটি কথা ছিল :

"মাউন্ট বেটন সাহেব ও,
তুমার সাধের বেটন কার হাতে থইয়া গেলায় ও।
তুমার সুনার পুরী আন্‌ধার কইরা ও
তুমি কই চলিলায়,
সাধের বেটন কার হাতে থইয়া গেলায় ও।
সর্দার কান্দে পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়,
কীরে হায় হায় হায়,
আর মাথাইয়ে যে মাথা কুটে, বলদায় বুক থাপড়ায়
তুমার শ্যামা চেট্টি ভক্তবৃন্দে ও
তারা ধুলায় গড়াগড়ি যায়,
সাধের বেটন কার হাতে থইয়া গেলায় ও।"

এই গানটি আরো লম্বা, সবটা লিখলাম না। গানটির নাম ছিল—"মাউন্টবেটন মঙ্গলকাব্য"।

১৯৪৮ সনের ২৬শে মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হয়ে গেল। পার্টির নেতারা অনেকেই আত্মগোপন করলেন। গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে যাঁরা পার্টি সভ্য ছিলেন তাঁদের কাজকর্মেও বেশ ভাঁটা পড়ে গেল।

সেই বৎসরেই (১৯৪৮ সনে) 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম হল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের দিনগুলি থেকেই শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। শম্ভু ও তৃপ্তি পার্ক সার্কাসে নাসিরুদ্দিন রোডে একটি বাড়িতে থাকত। ওদের বাড়িতেই নানা নাটকের কাজ শুরু হয়ে গেল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, তুলসী লাহড়ী, গঙ্গাপদ বসু এবং আরো অনেক নাম করা নাট্যজগতের লোক প্রায় রোজই শম্ভুদের বাড়িতে জড়ো হতেন। আমি যদিও আগে দুয়েকবার 'রক্তকরবী'তে অভিনয় করেছি এবং আমাদের অফিসের একটি নাটকে একবার অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তবুও নাটক ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তা সত্ত্বেও 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর রিহার্সালগুলি দেখতে যেতাম। শম্ভু তো দারুণ ধৈর্যসহকারে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওদের নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের নাটকের চরিত্রানুযায়ী তৈরী করে ফেলত। মঞ্চে আলোকসম্পাতে অভিজ্ঞ তাপস সেনও মাঝে মাঝে ওখানে যেত। শম্ভু তো একবার আমায় তুলসী লাহিড়ীর লেখা 'ছেঁড়াতার' নাটকে মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে নিল।।

কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার পর থেকেই কলকাতার আই পি টি এ-র কাজেও বেশ ভাঁটা পড়ে গেল। বিনয় রায়ই

ছিল এখানকার গণনাট্য সঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্র। হঠাৎ জানতে পারলাম বিনয় তাঁর স্ত্রী জয়াকে নিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে রাশিয়ায় চলে গিয়েছে এবং সেখানে মস্কো রেডিও থেকে বাংলায় খবর পড়ছে। তখন থেকেই কলকাতার আই পি টি এ বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিল।

ঠিক সন-তারিখ মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব ১৯৪৯ সনে আমার হাতে একটি গোপন চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেই চিঠিতে আনডার গ্রাউণ্ড পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল। কয়েকজন মিলে স্থির করে ফেললাম রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেই টাকা তোলা হবে। পঙ্কজদার পরেই সেই দিনগুলি থেকে কলকাতার রবীন্দ্রসংগীতজগতের 'হিরো' হেমন্ত মুখার্জি এবং অসামান্য কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কলকাতার রবীন্দ্রসংগীত জগতের 'হিরোইন' সুচিত্রা মিত্রকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। হেমন্তকে অর্জুনের গান এবং সুচিত্রাকে চিত্রাঙ্গদার গানের ভার দিয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের তরুণতরুণীদের অন্যান্য গান ও নাচের দায়িত্ব দিয়ে রিহার্সালের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। রিহার্সালগুলি হত আমার ঘরেই। পরে একদিন কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে (খুব সম্ভব চৌরঙ্গী রোডের ওয়াই এম সি এ-র হলঘরে) 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি খুব সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হল। সংগৃহীত সমস্ত টাকা সুড়ঙ্গপথে যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল।

১৯৫১ সনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সরকারের কোপদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেল এবং বেআইনী নাম ঘুচল। তবে ভাঙা পার্টি জোড়া লাগতে অনেক সময় কেটে গেল।

১৯৫৩ সনে ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে একটি শিল্পীদলের সঙ্গে আমাকেও চীনদেশে পাঠানো হয়েছিল। দেশে ফিরে চীনদেশে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমার কয়েকটি লেখা তখনকার দিনের

'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। সেই পুরনো লেখাগুলি ১৩৮৫ সালের পয়লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল ১৯৬৮) 'অন্তরঙ্গ চীন' নাম দিয়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করেছি।

১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'গীতবিতান' সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব গৃহনির্মাণ তহবিলের সাহায্যকল্পে কলকাতার 'নিউ-এম্পায়ার' প্রেক্ষাগৃহে তিনদিনব্যাপী রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন। অনুষ্ঠানগুলি হয়েছিল ১৯৫৪ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায়, ২১শে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। সেই অনুষ্ঠানে কলকাতার নামকরা গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে আমাকেও গানের জন্য নেওয়া হয়েছিল।

তার পরেও গীতবিতানের বহু অনুষ্ঠানে আমায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এবং আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে করতে আমার নিজের অভিজ্ঞতা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে এগিয়ে চলছিল। এ সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমি আমার অনেক চিঠিপত্রে ব্যক্ত করেছি। সেই চিঠিগুলির কথা পরে উল্লেখ করব।

১৯৫৫ সনে ভারত সরকার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমাকে আবার চীনদেশে পাঠিয়েছিল। তখনকার অভিজ্ঞতার ব্যাপার কিছুই লিখিনি।

হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে প্রথম প্রবেশ

১৯৫৮ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে রেঙ্গুন শহরে ব্রহ্মদেশীয় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের দশম অধিবেশন উপলক্ষে আমায় গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই সম্মেলনে কলকাতা থেকে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু মহাশয় এবং পূর্ববাংলার (তখনকার পূর্বপাকিস্তান) একজন তরুণ সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং লোকসংগীত গায়ক মমতাজ আলী খানও আমন্ত্রিত হয়ে রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। বুদ্ধদেববাবু এবং আমাকে সেই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পূর্ণেন্দুমোহন বসু মহাশয়ের বাড়িতে রাখা হয়েছিল। তাঁর আতিথেয়তার কথা ভোলা যায় না। তিনি এখন সপরিবারে কলকাতায় নিউ আলিপুরে বসবাস করছেন। রেঙ্গুন শহরে পৌঁছেছিলাম ৪ঠা এপ্রিল—আবার দেশে ফিরে আসার জন্য রওনা হলাম ১১ই এপ্রিল। এরোপ্লেনে বসে কী একটি বই পড়ছিলাম—হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমায় নমস্কার জানিয়ে তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন—তাঁর নাম চণ্ডীচরণ সাহা। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী তাঁদেরই। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমায় তিনি চিনলেন কী করে। উত্তরে তিনি বললেন তিনি আমার জ্যাঠতুতো দাদা অজয় বিশ্বাসকে এবং আমার বৌদি কনক বিশ্বাসকে খুব ভালো করেই চেনেন এবং সেই সূত্রে আমাকেও নাকি ভালো করে চেনেন।

তারপর তিনি আমায় বললেন, "আপনি তো অনেক বৎসর হয়ে গেল হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্ কোম্পানীতে রেকর্ড করছেন না—কী কারণে রেকর্ড করছেন না তাও আমরা জানি। আপনি কী হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করবেন?" আমি বললাম, "বেশ, আমি রেকর্ড করব।" উনি তখন বললেন, "আপনি আমায় কথা দিলেন তো?" আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ, আমি আপনাকে কথা দিলাম।"

তারপর বেশ কয়েক বৎসর কেটে গেল ১৯৫৮-১৯৫৯ সনও পেরিয়ে গেল। ১৯৬০ সনের শেষদিকে, ঠিক কোন মাসে আমার মনে পড়ছে না, একদিন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএ হিন্দুস্থান বিল্ডিংে অবস্থিত আমাদের অফিসের চারতলায় চণ্ডীবাবুর সঙ্গে জগদীশ চক্রবর্তী নামের এক ভদ্রলোককে দেখলাম এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে কী খুঁজছেন। জগদীশবাবুকে নিউ থিয়েটারস্ স্টুডিওতে যখন রাইচাঁদ বড়াল এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক আমায় কয়েকটি ফিল্মে কোরাস গান গাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন থেকেই চিনতাম। ওঁদের দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "জগদীশদা, আপনারা কি Loan Department খুঁজছেন?" জগদীশদা হেসে বললেন—"কী যে বলো, Loan Department খুঁজব কেন? আমরা তো তোমাকেই খুঁজছি।" তখন ওঁদের ডেকে নিয়ে আমার টেবিলের ধারে বসালাম। তারপর আমায় তাঁরা কেন খুঁজছেন জিজ্ঞেস করলাম। জগদীশদা আমায় প্রশ্ন করলেন, "তুমি চণ্ডী-বাবুকে রেঙ্গুন থেকে ফেরার পথে এরোপ্লেনে কি কথা দিয়েছিলে যে হিন্দুস্থানে তুমি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করবে?" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছিলাম।" তখন জগদীশদা বললেন, "তাহলে তুমি এই দু বছরের মধ্যে চণ্ডীবাবুর সঙ্গে দেখা করোনি কেন?"

তখন আমি বলেছিলাম, "জগদীশদা, আমি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করব এই কথাটিই শুধু দিয়েছিলাম। চণ্ডীবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি কোনো কথা দিইনি। চণ্ডীবাবুও তো আমার কোনো খোঁজ করেননি।" তখন ওঁরা দুজনেই খুব হেসে উঠলেন। তারপর জগদীশদা বললেন, "সেই জন্যেই তো আমরা তোমার কাছে এলাম।" জিজ্ঞেস করে জানলাম, জগদীশদাও নাকি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি। তখনকার দিনে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার আগেই গানগুলি মিউজিক বোর্ডে পাঠিয়ে অনুমতি নিতে হত। পরে আবার রেকর্ডগুলি বোর্ডকে দিয়ে অনুমোদিত করানো হত। "আকাশ ভরা সূর্য তারা" এবং "যেতে যেতে একলা পথে" এই গান দুটি রেকর্ড করবার অনুমতি চাইতে চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ জানালাম এবং অনুমতি পেলে আমায় খবর দিতে বললাম ; তাছাড়া এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানী যে আমায় ছেড়ে দিতে রাজী আছেন তার ব্যবস্থাও করতে বললাম। সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে চণ্ডীবাবু আমায় খবর দিলেন যে মিউজিক বোর্ডের অনুমতি নাকি এসে গিয়েছে। বহু বৎসর পরে আমার নিজের পরিচালনায় এবং দায়িত্বে ওই গান দুটিই হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী প্রকাশিত আমার প্রথম রেকর্ড। সেই রেকর্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সনের মার্চ মাসে।

সেই সময়ে কবি শৈলেন রায়ের বিশেষ অনুরোধে তার দুটি গান রেকর্ড করেছিলাম---সুরকার ছিলেন কমল দাসগুপ্ত। গান দুটির কথা ছিল ১। "তোরা যে জাত বাঙালী", ২। "দেশ ভেঙেছে তাই।" যদিও রেকর্ড প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু তা শ্রোতাদের মোটেই খুশি করতে পারেনি। তারপর থেকে পর পর অনেক রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছিলাম এবং সেই গানগুলি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের পালা শুরু হল। সেই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য প্রদেশের অনেক শহরে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার জন্য আমায় যেতে হয়েছিল। কলকাতা শহরের নানা অফিসে ও নানা অঞ্চলে এবং শহরের বাইরেও নানা অঞ্চলে শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কত অনুষ্ঠানে যে আমায় গান গাইতে হয়েছিল তার হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে এখন একেবারেই সম্ভব নয়। ১৯৬১ সন থেকে রবীন্দ্রনাথ যেন আরো জীবন্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও খুব কদর বেড়ে গেল। নিজের সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলা উচিত হবে না।

ইতিমধ্যে অনাদিদাও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি মিউজিক বোর্ডের কাজকর্মও চালাতে পারলেন না। খুব সম্ভব ১৯৬২ কিংবা ১৯৬৩ সন থেকে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ডগুলির অনুমোদনের কাজ ছেড়ে দিলেন। মিউজিক বোর্ড তখন দুজন শান্তিনিকেতন থেকে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর ওপরে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। কার বা কাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই দায়িত্ব ওদের দেওয়া হয়েছিল তা আমার জানা নেই।

১৯৬৪ সনে হঠাৎ হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী থেকে একটি চিঠি পেলাম- এই ধরনের চিঠি আমি আগে কখনও পাইনি। ওই চিঠিটির সঙ্গে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের একটি চিঠির নকলও আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। দুই চিঠির নকল নিচে লিখে দিচ্ছি। চিঠিগুলি ইংরেজী ভাষায় টাইপ করা ছিল।

HINDUSTHAN MUSICAL PRODUCTS LTD

6-1 Akrur Dutta Lane

Calcutta—12

Dated 9th March 1964

Ref. Recg, NB,

Sree Debabrata Biswas

Hindusthan Accounts Dept.

L. I. C. Hindusthan Building

Calcutta.

Dear Sir,

We are enclosing herewith a copy of letter received from Viswa-Bharati Music Board pertaining to 4 songs recorded by you for your kind information and necessary action.

Thanking you

Yours faithfully.

Hindusthan Musical Products Ltd.

Encl : 1

(কার সই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

Recording Dept.

এবার বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীকে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন তার নকল নিচে দিলাম।

(True Copy)

From—VISWA-BHARATI MUSIC BOARD
5, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta—7

Ref : MB/332 March 6. 1964

To Messrs Hindusthan Musical Products Ltd.
Calcutta—12

Dear Sirs,

This has reference to your letters No. Recg : NB dated February 3, 1964 and 20th and 12th January 1964.

The recroded tapes of Rabindranath Tagore's songs (vocal and instrumental) as stated below were heard and the comments made by the Examiner with regard to some spcei-fic cases have been noted against them. We have to request you to act in accordance with the suggestion made by the Examiner and to take particular care in future so that such irregularities do not recur in future

Sj Debabarta Biswas,

HSB 7217—Sudhu Jaoa Asha—O. K. (take 1)

" 7218—Essechiilo Tabu Aso Nai—Should be re-taken, cannot be approved. Inspite of repeated requests to control and restrict uncalled for composed musical interludes, the same have been applied freely making the production awfully jarring and distorted.

HSB 7190-1 Megh Bollachey Jabo Jabo—awtully melo-dramatic voice productions Echo-Chamber which seems to have been used have uttery spoiled the fine note combinations in the song. Cannot be approved.

" 7191 Godhuli Gagane Meghe—O. K. (Take II)

Yours faithfully

Sd/

Hony. Secretary.

বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের চিঠিতে HSB 7218 নম্বর গানের প্রথম কথাটি লেখা হয়েছে "Essech llo"—কথাটি বাংলায় উচ্চারণ করতে গেলে দাঁড়াবে "এসেচিল্লো" অথচ গীতবিতানে কথাটি আছে—"এসেছিলে"। আবার HSB 7190-1 নম্বর গানের প্রথম দুটি শব্দ লেখা হয়েছে "Megh Bollachey"—কথাদুটি বাংলার উচ্চারণ করতে হলে বলতে হবে "মেঘ বল্লেচে"। ঐ শব্দগুলি ঐ বিশেষ কায়দায় ইংরেজী ভাষায় হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী লিখেছিলেন, না বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড লিখেছিলেন তা আমার জানা নেই, জানবার চেষ্টাও করিনি। যাই হোক চিঠি দুখানি নিয়ে একদিন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অফিসে হাজির হলাম। সেই দিনগুলিতে গোপেশ সেন নামে এক ভদ্রলোক বিশ্বভারতীর কলকাতা অফিসে একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন - তাঁর কাছে গিয়েই বসলাম। আমায় দেখে ওই অফিসের আরেকজন ভদ্রলোক- নাম পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলী, গোপেশবাবুর কাছে এলেন। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যে চিঠিখানা হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠির

নকলটি নিয়ে গোপেশবাবুকে দেখিয়ে বললাম—awfully কথাটির অর্থ আমি বুঝি Melodrama এবং Melodramatic কথাগুলির অর্থও আমার জানা; কিন্তু melodramatic voice production কথাগুলির অর্থ যে কী আমি কিছুই বুঝি না—ওই কথাগুলি বলতে কী বোঝায় তা আপনারা আমায় দয়া করে বুঝিয়ে দিন।" আমার কথায় গোপেশবাবু খুব হেসে উঠলেন। তার পর আমি গোপেশবাবুকে বললাম, "Musical interludes কথাগুলি সম্বন্ধে আমি তো আগে কোনো নির্দেশ পাইনি—তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ব্যাপারে কোনো নির্দেশ লিখে রেখে গেছেন কিনা তাও আমার জানা নেই। যদি কোনো নির্দেশ তিনি লিখে দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কোন পুস্তকে সেই নির্দেশের খোঁজ পাওয়া যাবে আমায় দয়া করে বলুন।" এবারও গোপেশবাবু আমার কথা শুনে বেশ একটু হাসলেন এবং রেকর্ডগুলির অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন এই আশ্বাস আমায় দিলেন। পূর্ণেন্দুবাবু ব্রাহ্ম, তাই তাঁকে আমি আগেই চিনতাম। গোপেশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার পর পূর্ণেন্দুবাবুকে বলে এলাম যে ওঁদের যে পরীক্ষকটি আমার গান দুটি অনুমোদন করেন নি তিনি দুয়েক জায়গায় বেশ বড়াই করে আমার গান অনুমোদন না করার ব্যাপারটি বলে বেড়িয়েছেন এবং সেইসব জায়গা থেকেই খবরটি আমার কানে মিউজিক বোর্ডের চিঠি পাবার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। সেই পরীক্ষকটি আমার চাইতে বয়সে দশ-বারো বৎসরের ছোট, সুতরাং তাঁকে দিয়ে আমার রেকর্ড অনুমোদন না করানোটাই সমীচীন। এই কথাগুলি বলে চলে এলাম।

এই ঘটনাটির কয়েক মাস পরে হঠাৎ আমার একটি বিশেষ স্নেহের পাত্রী এবং বিশেষ খ্যাতিসম্পন্না রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা, আমার ঘরে উপস্থিত হলেন। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড রেকর্ড অনুমোদন

করার দায়িত্ব তাঁকেও দিয়েছিলেন। কবে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, সেই তারিখটি আমার মনে পড়ছে না। তবে ১৯৬৪ সনের শেষের দিকেই, তা মনে আছে। তিনি বললেন, "এসেছিলে তবু আস নাই" গানটির আমার রেকর্ডে একটি জায়গায় সামান্য একটু ত্রুটি তাঁর কানে লেগেছে—তাই গানটি আবার রেকর্ড করতে অনুরোধ করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানলাম "চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে" এই কথাগুলির প্রথমে "চন্" কথাটি স্বরলিপি অনুযায়ী হয়নি। তখন আমি তাঁকে ওই জায়গাটি গেয়ে শোনাতে বললাম এবং তিনি নিজে গেয়ে শোনালেন। তখন তাঁকে আমি বলেছিলাম যে তাঁর গাওয়াটিও ঠিক স্বরলিপি অনুযায়ী হয়নি কারণ উনি "চন্" কথাটি নিচের মধ্যম সুর থেকে চড়া কোমল গান্ধার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ায় পুরো দুই মাত্রা লেগে যাচ্ছে অথচ স্বরলিপির বইয়ে আছে শুধু একমাত্রায়; তবে মধ্যম সুরটি gracenote হিসাবে স্বরলিপির বইয়ে লেখা হয়েছে। তখন আমি তাঁকে বললাম যে আমি আরো দুয়েকজন প্রবীণ গায়ক বা গায়িকার মতামত সংগ্রহ করে তাঁকে ব্যাপারটি আসলে কি ভাবে গাইতে হবে পরে জানাব। উনি রাজী হয়ে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নীরদ ব্যানার্জিকে বলে রাখলাম, শান্তিদেব ঘোষ হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে তাঁর গান রেকর্ড করতে যেদিন আসবেন, তার দুয়েক দিন আগেই যেন আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেদিন আমি ওখানে হাজির থাকতে পারি। পরে নীরদবাবু আমায় খবর দিলেন শান্তিদেববাবু ১৯।১।৬৫ তারিখে অক্রুর দত্ত লেনে রেকর্ডিং কোম্পানীতে আসবেন। খবর পেয়ে আমি অষ্টপঞ্চাশতম খণ্ডের স্বরবিতানটি নিয়ে ওখানে উপস্থিত হলাম। "এসেছিলে তবু আস নাই" গানের টেপটি শান্তিদেববাবুকে শোনানো হল এবং আমার গানের

যে অংশটির খুঁত বা ত্রুটি ধরা হয়েছিল সেই খবরটিও তাঁকে বললাম। তখন তিনি আমায় জানালেন যে আমি যেভাবে গানটি গেয়েছি তাতে কোন দোষ হয়নি। তাঁর মন্তব্যটি একটি কাগজে লিখে দিতে অনুরোধ করায় উনি লিখে দিলেন এবং আমার স্বরলিপির বইটিতেও সেই ভাবে লিখে নিজের স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়ে দিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

"র্ম
| জ্ঞ´-ঋ´ | এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। এতে কোন দোষ
| চ ন্ |

নেই। আমার মনে হয় ছাপার কোন গোলমাল ঘটেছে।"

(স্বাঃ) শান্তিদেব ঘোষ। ১৯।১।৬৫

শান্তিবাবুর স্বাক্ষর দেওয়া কাগজটি মিউজিক বোর্ডের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং উপর্যুক্ত গায়িকাকে খবরটি জানিয়ে দিয়েছিলাম। পরে গানটি মিউজিক বোর্ডের অনুমোদন পেল।

১৯৬৫ সনের পরেও অনেক গান আমি রেকর্ড করেছিলাম এবং হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীও খুব উৎসাহের সঙ্গে সেই রেকর্ডগুলি প্রকাশ করতে লাগলেন। কী কী গান ওই সময়ে রেকর্ড করা হয়েছিল তার তালিকা আমার পক্ষে দেওয়া এখন সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আগে লিখবার সুযোগ পাইনি। হিন্দুস্থান মিউজিকাল প্রোডাক্‌ট্‌স লিঃ অর্থাৎ হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে যখন গান রেকর্ড করাতে শুরু করলাম তখন থেকেই কোম্পানীর পরিচালকদের আমার একটি বিশেষ মানসিকতার কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম। তা হল আমার গানের রেকর্ডের প্রচারের ব্যাপারে যেন কোনো বাড়াবাড়ি না হয় এবং কোনো পত্রপত্রিকাতে যেন আমার রেকর্ডগুলি সমালোচনার জন্যে না দেওয়া হয়। এমনকি রেকর্ডের

ক্যাটালগ যা মাঝে মাঝে প্রকাশ করা হত তাতে আমার কোনো ফোটো বা ছবি দিতে আমি রাজী হতাম না। তবে যেবার আমার প্রথম লং প্লেইং রেকর্ড বার করা হয় সেবার (কোন সন বা বৎসর আমার মনে পড়ছে না) রেকর্ডিং কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার নীরদ ব্যানার্জির অনেক বারের অনুরোধে আমি আমার একটি ছবি নীরদবাবুকে দিয়েছিলাম এবং সেই ছবিটি তাঁরা কয়েকটি লং প্লেইং রেকর্ডের কভারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৬৭ সনের শেষের দিকে কোনো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখলাম আমার একটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের সমালোচনা প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও সমালোচনাটি প্রশংসাসূচকই হয়েছিল তবুও আমার মানসিকতার কথা উল্লেখ করে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীকে বেশ একটু কড়া ধরনের চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠির উত্তরে রেকর্ডিং কোম্পানী আমার ৪-১২-৬৭ তারিখে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা নিচে দিলাম :

Hindusthan Musical Products

6/1 Akrur Dutta Lane
Cal—12
4. 12. 67

Ref. Recg/NB

Sree Debabrata Biswas

174E Rashbehari Avenue, Ballygunge, Cal.

Dear Sir,

We are extremely sorry that through our oversight we had sent your Record No H 2401 to different papers for review inspite of your request to us not to do likewise.

We have already served written instruction to the department concerned as not to do likewise in future and we hereby assure you that similar incident will not be repeated in future under any circumstances and no record of yours will be reviewed in any paper (excepting the said Record No. H. 2401).

We shall be much obliged if you kindly excuse for this oversight.

Yours faithfully
Hindusthan Musical Products Ltd.
(Sd/) Illegible
Director

বলা বাহুল্য এই ঘটনার পরে রেকর্ডিং কোম্পানী তাঁদের কথা রেখেছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর পরে, হঠাৎ ৫।৮।১৯৬৯ তারিখে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের ২৫শে জুলাই ১৯৬৯ তারিখের একটি চিঠির নকল আমায় পাঠালেন এবং তাতে জানলাম আমার দুটি গানের রেকর্ড মিউজিক বোর্ড অনুমোদন করেন নি। গান দুটি হল ১। "পুষ্প দিয়ে মারো যারে" ২। "তোমার শেষের গানের।" হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীকে লেখা মিউজিক বোর্ডের সেই চিঠিখানার নকল নিচে দিলাম।

July 25, 1969

Messrs Hindusthan Musical Products Ltd.

6/1 Akrur Dutta Lane,

Calcutta—12

Re : Tune approval of Rabindranath Tagore's songs

Dear Sirs,

On the basis of the report received from the examiner who heard the tune of the following songs sung by Sri Debabrata Biswas we give below our viaws on them :

1. HSB. 8445 : **Puspa Diya Maro Jare.**

"Excessive music accompaniment hampers the sentiment of the song."

2. HSB. 8472 : **Tomar Sesher Giner.**

"The tempo of the song is too quick. Music accompaniment is too much and the song itself is not sung according to notation."

The above two songs should be re-recorded after eliminating the above defects and submitted to the Board for re-examination. The recorded tape has already been sent back to you.

Yours faithfully,

Hony, Secretary

Visva-Bharati Music Board

Certified to be true copy of the letter

Hindusthan Musical Products Ltd.

Sd/—(Illegible)

6/1 Akrur Dutta Lane,

Calcutta—12

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যার ওপর আমার উপর্যুক্ত রেকর্ড-গুলির অনুমোদনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি যে গানগুলি অনুমোদন করেননি এই খবর তাঁর পরিচিত এবং পরিচিতা কয়েকজনের কাছে বলেছিলেন। তাঁরা আমায় অত্যন্ত ভালোবাসেন বলেই অনুমোদন না করার খবরটি আমায় আগেই দিয়েছিলেন। তাঁরা কেউ আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলার বা আমায় মিথ্যা খবর দেবার মত লোক নন। এঁদের কারো নাম আমি ইচ্ছে করেই লিখলাম না কারণ আমার মনে হয়েছে এভাবে নামোল্লেখ আমার উচিত হবে না। যাই হোক মিউজিক বোর্ডের বিচারের খবর পেয়ে মনটা আমার খুব খারাপ হয়েছিল, তাই চুপ করেছিলাম। কিন্তু হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর নীরদবাবু আমার মতামতের জন্য খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর বিশেষ অনুরোধে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর নামে—১৯৬৯ সনে ১৬ই আগস্ট একটি চিঠি দিলাম। সেই চিঠিখানার একটি নকল নিচে দিলাম। সেই চিঠিখানা আমার অক্ষম ইংরেজী ভাষাতেই লেখা হয়েছিল :

M/S Hindusthan Musical Products Ltd.

6-1 Akrur Dutta Lane,
Calcutta—12

Ref : Your letter dated 4-8-69 enclosing a copy a letter dated 25-7-69 from the Hony, Secretary, VISVA BHARATI MUSIC BOARD

Dear Sir,

Mr. Nirode Banerjee of your company has been pressing me hard for my comments on the views of the Music Board

regarding recording of two songs "Pushpa Diye Maro jare" and "Tomar shesher Ganer". As a matter of the fact, the points referred to by the Examiner of the Music Board, are absolutely subjective and as such, any comment is absolutely unnecessary. Formerly, in the matter of recording of Tagore songs, it was the function of the Music Board to check up whether there was any deviation from the printed notation. I have thoroughly gone through the works of Tagore and also listened to his speeches relating to this subject but nowhere in his writings I have found the Poet prescribing any limits to "Music accompaniment" and also "Tempo" for recording of his songs. As such, it occurs to me that the Examiner of the Music Board has assumed the role of a "Dictator" and I am not aware since when this dictatorship was introduced in the Music Board.

You are surely aware that I have been singing and recording Tagore songs for a long time and I feel that my sense of responsibility and seriousness in this regard are in no way less than anybody else. I have seen persons possessing a creative mind engaged in new experiments in their respective sphere of activity who did not like the idea of repeating the existing art-patterns like birds and insects. Their examples were a source of inspiration to me and I, in my own humble way (with the help of your company), tried to do some experiments in my own sphere. I don't know what and how much I have done, but it is a fact that much remains to be done. It is a pity that I have to stop with a heavy heart

and it will take some time before I can re-mould my mind to work according to the directives of the Cultural Dictatorship of the V. B. Music Board.

For the present, I would request you to appeal to the Music Board to re-examine my recorded tape and allow some grace marks as a very special case, in consideration of my advanced age and also the huge loss of money for re-recording of the songs, so that the songs are approved.

Yours faithfully
Debabrata Biswas

174E, Rashbehari Avenue, Calcutta
the 16th August, 1969

আমার এই চিঠিখানা পেয়ে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী ২২শে আগস্ট ১৯৬৯ তারিখের এক চিঠিতে আমায় জানালেন যে তাঁরা আমার উপর্যুক্ত চিঠির একটি নকল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডকে পাঠিয়েছেন। রেকর্ডিং কোম্পানী আলাদা একটি চিঠিতে মিউজিক বোর্ডকে আমার গানের টেপ আবার পরীক্ষা করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং টেপ আবার বোর্ডে পাঠাবার অনুমতিও চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে রেকর্ডিং কোম্পানী থেকে এই ব্যাপারে আমি কোনো খবর পাইনি এবং ওই গান দুটির রেকর্ডও প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলাম বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড আমার উপর্যুক্ত গান দুটি অনুমোদন করতে রাজী

নন। তাই নিরাশ হয়ে রবীন্দ্রসংগীত আর রেকর্ড করব না বলেই মনস্থির করলাম। রেকর্ড কোম্পানীতে যাওয়াও বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৭০ সনে, ঠিক কোন মাসে মনে করতে পারছি না, হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয় তাঁর একটি পুত্রকে নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। চণ্ডীবাবু এর আগে আমার ঘরে কখনো আসেন নি তাই খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "একি! মালিকপক্ষ শ্রমিকপক্ষের বাড়িতে কেন?" চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন, "এটি আমার ছোট ছেলে, নাম শোভন। একে রেকর্ডিং কোম্পানীর কাজ চালাবার দায়িত্ব দিয়েছি। আপনি ওকে একটু দাঁড় করিয়ে দিন।" আমি বললাম, "চণ্ডীদা, আমি তো ব্যবসা ব্যাপারে কিছু জানিও না, কিছু বুঝিও না। আমি কী করে ওকে দাঁড় করাব? চণ্ডীবাবু বললেন, "ব্যবসা শোভন শিখেছে—আপনি দয়া করে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করা বন্ধ করবেন না, আপনি আবার রেকর্ড করতে শুরু করুন, তাহলেই শোভন দাঁড়িয়ে যেতে পারবে।" তখন আমি চণ্ডীবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড আমার রেকর্ড অনুমোদন করছেন না—রেকর্ড করবার সময় আমি অনেক বাদ্যযন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে থাকি; সেইসব বাদ্যযন্ত্রীর পারিশ্রমিক বাবদ প্রচুর অর্থ আমাদের রেকর্ডিং কোম্পানী খরচ করে থাকেন। রেকর্ডগুলি অনুমোদিত না হলে সমস্ত টাকাটাই কোম্পানীর লোকসান হয় এবং তাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করি। আমি যদি আবার রেকর্ড করি এবং সেই সব রেকর্ড যদি অনুমোদিত না হয় তাহলে কোম্পানীর লোকসান আরো বেড়ে যাবে। তখন ব্যাপারটি আমার কাছে আরো ভীষণ লজ্জাজনক হয়ে উঠবে। তখন চণ্ডীবাবু আমায় বললেন, "আপনি তো ব্যবসা জানেন না; ব্যবসা করতে গেলে লাভ

লোকসান লেগেই থাকে। আপনার চাইতে আমি বয়সে বেশ বড় ---আপনি আমার এই অনুরোধটি রাখুন।" চণ্ডীবাবুর এই ধরনের কথাতে আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়লাম এবং তাঁর কথামত কিছু গান রেকর্ড করে দিতে রাজী হয়ে গেলাম কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে বললাম, "চণ্ডীদা, যদি মিউজিক বোর্ড আমার কোনো গান অনুমোদন না করেন তাহলে আমায় কিন্তু দায়ী করবেন না কিংবা দোষও দেবেন না।" চণ্ডীবাবু আমায় আশ্বাস দিলেন এবং বললেন এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করবেন। চণ্ডীবাবুর সঙ্গে এই কথা হয়ে যাবার পর ১৯৭০ সনের শেষ দিকে এবং ১৯৭১ সনের প্রথম দিকে অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত আমি হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করেছিলাম। সেই গানগুলির সংখ্যা আমার এখন মনে নেই। ওই গানগুলির মধ্যে কয়েকটি গান নাকি মিউজিক বোর্ডের অনুমোদন পায়নি এই খবরটি মৌখিকভাবে আমি পেয়েছিলাম কিন্তু রেকর্ডিং কোম্পানী চিঠি দিয়ে আমায় কিছু জানান নি। এ ব্যাপারে বিশেষ-ভাবে কিছু জানবার আগ্রহ আমার ছিল না কারণ চণ্ডীবাবুর বিশেষ অনুরোধেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গানগুলি রেকর্ড করতে রাজী হয়েছিলাম। তারপর থেকে রবীন্দ্রসংগীত আর রেকর্ড করার মত উৎসাহ আমার একেবারেই ছিল না---তাই আর কোনো রবীন্দ্রসংগীত আমি রেকর্ড করিনি।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে

১৯৭১ সনের জুলাই মাসে একটি মজার কাণ্ড ঘটেছিল। মেজর জিতেন্দ্র লাহিড়ী নামে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তিনি এখন আর ইহলোকে নেই। সেই সনের জুলাই মাসে (তারিখটি আমার মনে নেই) একদিন হঠাৎ মেজর লাহিড়ী খুব উত্তেজিত অবস্থায় আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার মেজর?" তাতে উনি বললেন, "সৌম্যদার (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে এইমাত্র খুব জোর ঝগড়া করে এলাম।" আমি বললাম, "শুনেছি সৌম্যদার সঙ্গে তো আপনার আত্মীয়তা আছে, তাঁর সঙ্গে আবার ঝগড়া হল কেন?" তখন তিনি বললেন সৌম্যদার বাড়িতে নাকি কলকাতার তুটি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তনের তুজন শিক্ষক সেদিন বসেছিলেন এবং তাঁরা নাকি আমার গানের খুব তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং সেই সময়ে তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সৌম্যদা তাঁদের কথায় সায় দিচ্ছিলেন বলেই তিনি সৌম্যদার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে এসেছেন। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে সৌম্যদা নিশ্চয়ই ওঁদের সঙ্গে একটু মজা করবার উদ্দেশ্যেই হয়তো একটু টিপ্পনী কেটেছিলেন। কারণ ১৯৬২ সনে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার সময়ে সৌম্যদা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলার পরেই আমার রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেছিলেন এবং সেই সব কথা আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু মেজর কিছুতেই তা মানতে রাজী হলেন না। তখন আমি মেজর লাহিড়ীকে বলেছিলাম, "মেজর, আপনি অনুগ্রহ করে মাস দেড়েক পরে সময় করে একবার আমার ঘরে আসবেন—আমি আপনাকে একটি মজার জিনিস দেখাব।" তারপর মেজর বাড়ি ফিরে গেলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন আগেই সৌম্যদা তাঁর নিজের রচিত গানের কথা আমায় বলেছিলেন এবং তাঁর নিজের গানের স্বরলিপির বইও আমায় উপহার পাঠিয়েছিলেন।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর আমি সৌম্যদার এলগিন রোডের বাড়ির ঠিকানায় একটি চিঠি লিখে পাঠালাম। আমার সেই চিঠিতে তাঁকে আমি জানিয়েছিলাম যে তিনি তো আমাদের দেশের এবং বিদেশেরও রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। আমার জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বাংলাদেশের আমার ভাইবোনেরা জীবন-মরণ পণে যে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন সেই লড়াইকে তিনি সমর্থন করেন কিনা আমি জানতে চাইলাম। যদি সেই লড়াই এর প্রতি তাঁর সামান্য একটু সমর্থন থাকে তাহলে ওদের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে দুটি গান আমায় লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানালাম, যাতে সেই গান দুটির রেকর্ড প্রকাশ করে এবং নানা অনুষ্ঠানে গেয়ে এপার বাংলার জনসাধারণকে বাংলাদেশের আমার ভাইবোনদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল করে তুলতে পারি। সৌম্যদা আমার এই চিঠি পেয়ে ১৫ই জুলাই ১৯৭১ তারিখে বোম্বাই থেকে আমায় একটি চিঠিতে জানালেন যে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই বোম্বাই শহরে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে গিয়েছেন। তাঁর সেই চিঠির সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে একটি গানও স্বরলিপি করে লিখে আমায় পাঠালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেওয়া

সুরের একটু অদল বদল করবার স্বাধীনতাও আমায় দিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে সৌম্যদা আরেকটি গান এবং তার স্বরলিপি লিখে ডাকযোগে আমায় পাঠালেন। সেই সময়ে আমিও বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। একটু সুস্থ হয়ে উঠে তাঁর গানগুলির দুয়েকটি কথা এবং সুর পরিবর্তন করে নেবার অনুমতি চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখে-ছিলাম। আমার সেই চিঠির উত্তরে সৌম্যদার কাছ থেকে যে চিঠি-খানা পেয়েছিলাম, মেজর লাহিড়ীকে ডেকে এনে সেই চিঠিখানা তাঁকে দেখালাম। চিঠিখানা পড়ে মেজর নির্বাক-বিস্ময়ে আমার দিকে বেশ কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "জর্জদা একি।" তখন আমি তাঁকে বললাম, "মেজর সাহেব, আপনারা সৌম্যদাকে ঠিকমত চিনতে পারেননি—উনি অত্যন্ত রসিক। তিনি যে সেদিন আপনাদের সঙ্গে বেশ একটু মজা করে কথা বলছিলেন, আপনারা বোধহয় তা টের পাননি এবং বুঝতেও পারেননি—তাই খুব উত্তেজিত হয়ে রাগারাগি করেছিলেন। এই চিঠিখানাও দেখুন না তিনি নিজের সম্বন্ধে কী রকম মজা করে আমায় একটি প্রশ্ন করেছেন। আমি যে রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী ছিলাম উনি আবার সেই রাজনৈতিক মতবাদকে মোটেই পছন্দ করতেন না। বরঞ্চ তাঁর রাজনৈতিক মত ছিল অন্য ধরনের। সেই ব্যাপারেও অনেক মজার মজার আলোচনা ও কথা কাটাকাটি তাঁর সঙ্গে আমার অনেকবার হয়েছে, কিন্তু কোনোদিন তাঁর সঙ্গে রাগারাগি হয়নি।" আমার কথা শুনে মেজর বিদায় নিলেন। সৌম্যদার সেই চিঠিখানার একটি বিশেষ অংশ নিচে উদ্ধৃত করলাম।

৪নং এলগিন রোড
কলকাতা-২০
১০।৯।৭১

প্রীতিভাজনেষু জর্জ,

তোমার চিঠি পেলুম। আমি একটু দুশ্চিন্তায় ছিলুম আমার চিঠিটা তোমার হাতে পৌঁচেছে না ডাকবিভাগের দৌলতে অন্তর্ধান হয়েছে—বুঝতে পারছিলুম না। এখন একেবারে নিশ্চিন্ত।

গায়ক হিসাবে তোমার গুণে অনেকদিন থেকে আমি আকৃষ্ট। গলায় কি যাদু নিয়ে এসেছ জানিনা, তোমার গান শোনবার পর আর কারো গান মনকে খুশি করে না, সব পানসে ঠেকে। কেউ কেউ বলে আমার বলার পর অন্যদের বলাও কিছুটা সে রকম ঠেকে। তুমি কি বলো?

এবারে গানটির কথা বলি। তোমার প্রস্তাবটি নিজে তো নেড়ে চেড়ে দেখলুমই, তাছাড়া আরো দু একজনকে বললুম। সবাই তোমার দিকে—আমি শুদ্ধু। তাই, "ঐ" তারা দলে দলে, চলে মুক্তিপতাকা তলে" এইটেই সাব্যস্ত হল। "ঐ" শব্দটির মধ্যে একটা সুদূরের ইঙ্গিত আছে, কল্পনাকেও পক্ষীরাজে চড়িয়ে তেপান্তর মাঠে ছেড়ে দেয়। এখন আর দেরী নয়। রেকর্ড করে ফেলো। আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি।

ইতি
শুভার্থী
সৌম্যদা

কয়েকদিনের মধ্যেই সৌম্যদার গান দুটি হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করে দিলাম এবং রেকর্ড কোম্পানীকে খুব শীগ্‌গির রেকর্ড করবার এবং এই রেকর্ডটির একটি বিশেষ Publicity বা প্রচারের ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়ে দিলাম (আগে ~~অবশ্য রবীন্দ্র~~-সংগীতের আমার রেকর্ডের এই ধরনের প্রচারের ব্যবস্থাতে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল)। যাই হোক, সৌম্যদার রেকর্ডের ব্যাপারে রেকর্ড কোম্পানী আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

করেছিলেন। সৌম্যদার গানের রেকর্ড যথাসময়েই প্রকাশিত হয়েছিল এবং বেশ কিছু সংখ্যা বিক্রিও হয়েছিল। গান দুটি ছিল :

১। ওই তারা চলে দলে দলে মুক্তি পতাকাতলে
পরাধীনতার কারা ধূলিতে মিশায় তারা,
হাতে হাত দিয়ে প্রাণে প্রাণ মিশে,
মুক্তি বাহিনী চলে।
মুক্তি বাহিনী নাশিছে শত্রু বাংলার হবে জয়
স্বাধীন হইবে বাংলার লোক জয় বাংলার জয়।
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।
শোনো বিপ্লব হুংকার বাংলার জনতার।
লক্ষ লোকের চলার আগুনে বাংলার পথ জ্বলে॥

২। শোনো বাংলার জনসমুদ্রে জোয়ারের হুংকার,
বিপ্লব স্রোতে নিঃশেষ হবে দুশমন জনতার।
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলার জয়।
মুজিবের ডাকে এক হয়ে গেছে হিন্দু মুসলমান
অমানিশা গেছে উঠেছে সূর্য আঁধারের অবসান।
বাংলাদেশের জনতার জয় এবারে সুনিশ্চয়,
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলার জয়।
বাংলা ভাষা সে জননী মোদের তারে কভু যায় ভোলা?
রবীন্দ্রবাণী অভয়মন্ত্র নিতি প্রাণে দেয় দোলা।
শোনো বাংলার মাঠে ঘাটে আজ আগুনের জয়গান
মুক্তি লভিতে বুকের রক্ত ঢালে তারা অফুরান।
বিশ্বের লোক বাংলার পানে বিস্ময়ে চেয়ে রয়,
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলার জয়!

স্বাধীন বাংলাদেশে আমার সংগীত পরিবেশন

১৯৭১ সনে ডিসেম্বর মাসে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারটি আমি প্রথম দিকেই উল্লেখ করেছি।

হাসপাতালে প্রায় মাসখানেক থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম ১৯৭২ সনের জানুআরি মাসের কোন তারিখে ফিরে এলাম আমার মনে পড়ছে না। অসম্ভব দুর্বলতার জন্য হাঁটাহাঁটি করতে পারতাম না। হাসপাতালে থাকতেই বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হয়ে যাবার খবর পেয়েছিলাম। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পর অনেকবার পূর্ববঙ্গে আমায় যেতে হয়েছিল। সেই দিনগুলিতে যাদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাণ হারিয়েছিলেন সে খবরও আমি পেয়েছিলাম। কুমিল্লায় থাকতে আমার এক পিসতুতো বোনের নাতি, তারও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি—সেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে ঢাকার ছাত্রসমাজ ওদের একটি অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য নেমন্তন্ন জানালেন। আমার শরীর দুর্বল থাকা সত্বেও রাজী হয়ে গেলাম। বাবুল ব্যানার্জিকে সঙ্গী করে ১১ই এপ্রিল এরোপ্লেনে ঢাকা চলে গেলাম। আমাকে আর বাবুলকে আমার বহুদিন আগেকার পরিচিত মনু কবীরের

(আহমেদুল) বাড়িতেই রাখা হল। প্রথম দিন বিকালে ঢাকার একটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমায় গাইতে হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ছায়ানট'। সন্‌জিদা খাতুন আমায় নেমন্তন্ন করে ওদের ছায়ানটে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরের দিন সুচিত্রা মিত্র ঢাকায় পৌঁছে গেলেন।

সন্ধ্যায় ঢাকার ছাত্রসমাজ মস্তবড় একটি মাঠে (খুব সম্ভব সুরাবর্দি উদ্যানে) বিরাট একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট হাজার কিংবা আরো বেশী হতে পারে ছাত্রছাত্রী সেই সমাবেশে জমায়েৎ হয়েছিলেন। একটি উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। মঞ্চের একপাশে কয়েকটি চেয়ার পাতা ছিল, তার একটিতে আমি বসেছিলাম। তখনও অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়নি, হঠাৎ একটি মহিলা এসে আমার ডানদিকের খালি চেয়ারটিতে বসে আমার কাঁধে মাথা রেখে, তাঁর বাঁ হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন, "জর্জদা গো আল্লা আমার কী করলেন—আমি শেষ চিহ্নটিও দেখতে পেলাম না।" কণ্ঠের আওয়াজে বুঝলাম মহিলাটি 'ফরিদা'। ফরিদা বারে বারে কেঁদে কেঁদে বলছিল, জর্জদা গো—আল্লা আমার কী করলেন।" ফরিদা হাসান আমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী—ওর স্বামী সারেতুল হাসানও আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রামে একবার গান গাইতে গিয়েছিলাম—তখন ওদের বাড়িতেই খুব আদর-যত্নের মধ্যে কয়েকটি দিন ছিলাম। ওরা কলকাতা গেলেই আমার ঘরে এসে দেখা করে যেত। ফরিদা যখন আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিল তখন কোনো কথাই আমি তার সঙ্গে বলতে পারিনি। কারণ আমার চোখ থেকে তখন অনর্গল জল ঝরছিল। মনটা এতো খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আমি সেই বিরাট আসরে বেশীক্ষণ গাইতে পারিনি। উদ্যোক্তারা আমায় প্রশ্ন করেছিলেন আমি এত তাড়াতাড়ি

গান শেষ করলাম কেন? তখন আসল কথা, ফরিদার দুঃখে আমি যে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, সেই কথাটি স্রেফ্ চেপে গেলাম। আর মুখে বললাম যে "আপনাদের শ্রোতারাই আমার গান বেশীক্ষণ শুনতে চাননি, তাই বেশীক্ষণ গাইনি। ওঁরা গান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি দিতে শুরু করেন তাতেই বোঝা যায় তাঁরা আমায় চাইছেন না।" আসলে ব্যাপারটি অন্যরকম—আমি ওখানকার শ্রোতাদের প্রিয় গানগুলি যেইমাত্র আরম্ভ করতাম, ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে পাঁচ-দশ সেকেণ্ড প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে আমায় তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাত তারপর চুপ করে শুনত। কিন্তু আমার বার বার ফরিদার কথাই মনে হচ্ছিল। ওর দুঃখে আমার মনটা যে ভাবে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল তাতে বেশীক্ষণ গাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এর চাইতে আরো খারাপ অবস্থায় আমায় পড়তে হয়েছিল আরেকবার ওই ঢাকা শহরেই সেই বৎসরে ডিসেম্বর মাসে।

১৯৭২ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারত সরকার দুই দেশের মধ্যে (অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে) বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে কলকাতার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে ঢাকা পাঠিয়েছিলেন। সেই দলে ছিলেন মঞ্জু গুপ্তা, ঋতু গুহঠাকুরতা, পূরবী মুখার্জি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরা সর্বাধিকারী খুব সম্ভব আগেই অন্য কোনো অনুষ্ঠানে ঢাকা গিয়েছিলেন—তাঁদেরও ভারত সরকার ওই প্রতিনিধি দলে নিয়েছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম ভারত সরকারের ইচ্ছাক্রমে। সেবারও বাবুল ব্যানার্জিকে সঙ্গী করে গিয়েছিলাম। আমাদের ওখানে 'পূর্বাণী' হোটেলে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কণিকা এবং গোরা বোধ হয় তাঁদের কোনো পরিচিত লোকের বাড়িতেই উঠেছিলেন। ঢাকা সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় হলঘরে আমাদের গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বেতারে ও টেলিভিশনেও গান প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ওই কয়েকদিনের মধ্যে একদিন সকালে বুলবুল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের একটি অনুষ্ঠানে আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই প্রতিষ্ঠানটি বাফা (B. A. F. A.) নামেই পরিচিত এবং পূর্ব পাকিস্তান থাকার আমলেই আমি অনেকবার সেই প্রতিষ্ঠানে গান করেছিলাম। গানের অনুষ্ঠান হবার আগে কিছু বক্তৃতার ব্যাপার ছিল। আমি প্রথম থেকেই শ্রোতাদের সঙ্গে একটি চেয়ারে বসে বক্তৃতা শুনছিলাম। সেই বক্তাদের মুখে বাফা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মীকে মুক্তিযুদ্ধের সময় কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বিবরণ শুনছিলাম। সেই কর্মীদের মধ্যে দুয়েক জনের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেইসব ইতিহাস শুনে আমার মনে যে কী দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। পরে গানের অনুষ্ঠান শুরু হল এবং সবার শেষে আমায় মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল। আমি হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম, বাজাতেও শুরু করলাম, কিন্তু কিছুতেই গান আরম্ভ করতে পারছিলাম না। একটু খাবার জল দিতে বললাম কিন্তু জল খেয়েও কোনো সুবিধে হল না। আমার ঝোলা থেকে একটু পান মুখে দিয়ে মনটাকে শক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম; তারপর আবার হারমোনিয়াম বাজাতে শুরু করলাম; গান শুরু করতে গিয়ে বেসুরে কান্নার আওয়াজ শুধু আমার গলায় আসছে। সেই আওয়াজ থামিয়ে দিয়ে হাতজোড় করে আমি কয়েকবার অস্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলাম, "আমায় আপনারা ক্ষমা করুন—আমি গাইতে পারছি না" এই কথাগুলিও আমি ঠিকমত বলতে পারছিলাম না। শ্রোতারা

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে সবাই স্তব্ধ হয়েছিলেন। মঞ্চ থেকে আমায় যখন ধরে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন দেখলাম মঞ্চের পিছন দিকে কয়েকজন আমার পেছনে বসেছিলেন তাঁদের চোখেও জল। ওঁদের সঙ্গে কোনো কথাও বলতে পারলাম না—কথা বলবার মতো অবস্থা তখন আমার ছিল না।

পূর্বাণী হোটেলে প্রথম রাত্রিরেই হাঁপানী রোগে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার এই অবস্থা দেখে হামিদা আতিক (বুলু) ওদের বাড়ি থেকে রোগীর পথ্য রান্না করে দুবেলা আমার জন্য নিয়ে আসত। পরে আরো দুয়েকজন আমার জন্য রোগীর পথ্য সব নিজেদের বাড়ি থেকে রান্না করে এনে দিয়ে যেতেন। এত খাবার জমে যেত যে অন্যদের ডেকে খাওয়াতে হত।

১৯৭২ সনের এপ্রিল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গিয়েছিলাম আগেই লিখেছি। সেবার ঢাকার টেলিভিশনের ডিরেক্টর মিঃ জামিল চৌধুরী তাঁদের কেন্দ্রে গান গাইতে আমায় অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমি রাজী হয়নি।

ওই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে আবার যখন ঢাকা গেলাম সেই চৌধুরীসাহেব আবার আমার সঙ্গে দেখা করলেন পূর্বাণী হোটেলে এসে। তিনি বললেন এবার ভারত সরকারের অনুরোধেই তিনি আমাদের সবাইকে টেলিভিশনে গাওয়াতে চাইছেন—আমাকেও তিনি নিয়ে যেতে চান। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আমায় যদি ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত গাইতে দেওয়া হয় তাহলেই আমি রাজী হব। উনি তখন আমায় জানালেন যে তাঁদের কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসংগীত ইংরেজী ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা করার মতো তাঁদের কোনো নিয়ম নেই। জিজ্ঞেস করলাম, "নিয়মটি কোনখানে তৈরী হয়েছে; রাওয়ালপিণ্ডি না ঢাকা?' তিনি হেসে বললেন, "ঢাকা"। আমি

তখন মিঃ জামিল চৌধুরীকে ঢাকার টেলিভিশন কেন্দ্রে কী কারণে আমায় ইংরেজী রবীন্দ্রসংগীত গাইতে দেওয়া হবে না তা ওই নিয়মকর্তাদের কাছ থেকে জেনে আমায় জানাতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু জামিলসাহেব আমার বক্তব্য জানতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে পরপর বলে যেতে লাগলাম :

১। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী ছিলেন এবং তিনি বহুবৎসর পূর্ববঙ্গের মাটিতে ও জলে বাস করেছিলেন তা ঢাকার কর্তারা জানেন কিনা।

২। রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববঙ্গে থাকতেন তখন এই পূর্ববঙ্গের মাটিতেই তাঁর অনেক লেখার জন্ম হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন কিনা।

৩। রবীন্দ্রনাথের একটি গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত অর্থাৎ National anthem হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা তাঁরা জানেন কিনা।

৪। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে ১৯১৩ সনের আগে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নামজাদা সাহিত্যিকরা বিশেষ কোনো মর্যাদা দিতে পারেন নি অথবা চাননি, এই তথ্যটি তাঁদের জানা আছে কিনা।

৫। পরে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী লেখা যখন তাঁকে বিদেশ থেকে 'নোবেল প্রাইজ' এনে দিল তখন থেকেই আমাদের বাঙালী সাহিত্যিকগণ তাঁকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানাতে লাগলেন এবং তাঁর সাহিত্যকেও বিশেষ মর্যাদা দিতে আরম্ভ করলেন, এই তথ্যটি ওই নিয়ামকরা জানেন কিনা।

৬। যদি এসব তথ্য তাঁদের জানা থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ভাষায় লেখা গানের সঙ্গে আমার নিজের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের বাসিন্দাদের কী কারণে আমি পরিচয় করিয়ে দিতে পারব না তা আপনাদের নিয়মকর্তাদের আমায় বোঝাতে বলা হোক।

আমার এই কথাগুলি ঢাকার টেলিভিশনের ডিরেক্টর মিঃ জামিল চৌধুরী শুনলেন এবং বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

জামিলসাহেব বিদায় নেবার প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরেই দুপুরে ঢাকায় অবস্থিত ভারতের হাইকমিশনের অফিস থেকে এক ভদ্রলোক হঠাৎ হোটেলে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আমি অনেক দিন আগে থেকেই চিনতাম। তাঁর নাম সুব্রত ব্যানার্জি। তাঁকে দেখেই বললাম, 'কী কমরেড, কী ব্যাপার?' তাঁর মুখেই শুনলাম যে মিঃ জামিল চৌধুরী নাকি হাইকমিশনারের অফিসে টেলিফোন করে আমার ইংরেজী রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ইচ্ছার কথা সব জানিয়েছেন কিন্তু তাঁদের এই ব্যাপারে অনেক অসুবিধা আছে। সুব্রতবাবু বললেন যে ভারত সরকার চাইছেন, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মিতালী যাতে সুদৃঢ় হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে সুব্রতবাবুর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল ; সেগুলি আর এখানে উল্লেখ করলাম না। সুব্রত-বাবুর বিশেষ অনুরোধে, অগত্যা আমি ঢাকার ইণ্টারকন্‌টিনেনট্যাল হোটেলে যেখানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে সংগীত পরিবেশন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে ছবি তোলা ও গান রেকর্ড করা হবে সেখানে যেতে রাজী হলাম। নির্ধারিত দিনের সন্ধ্যায় আমাকে ওই হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। গিয়ে দেখলাম একতলায় বিরাট হলঘর —প্রায় সাত-আটশো পুরুষ ও নারী নিমন্ত্রিত অতিথি, সুন্দর সাজপোশাকে সবাই সেজে এসেছেন।

বিরাট হলটিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মাঝখানে তিন-চার হাত চওড়া রাস্তার মতো জায়গা। ওই রাস্তার দুধারে সারি সারি পাতা চেয়ারে শ্রোতারা অপেক্ষা করছেন। সেই রাস্তার শেষদিকে দূরে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা এবং মঞ্চের ডানদিকেও একটি

টেলিভিশন ক্যামেরা। ক্যামেরাগুলি চাকা লাগানো, দেখতে অনেকটা ছোট কামানের মতো।

আমি সেখানে পৌঁছবার পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আমায় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গান গাইবার ফরমাশ দিয়ে গেলেন। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মঞ্চে গায়কগায়িকা বসবার জায়গার পিছন দিকে কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী সারি বেঁধে বসে আছেন। নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

ঢাকার শিল্পীদেরও সেখানে গান গাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। একবার ঢাকার শিল্পী, তারপরেই কলকাতার শিল্পী—এই ভাবেই অনুষ্ঠান চলতে লাগল। শেষে আমাব পালা এল। আমি প্রথম গান ধরলাম—"এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে—হাসিতে আকাশ ভরিলে" দুতিন লাইনে গাইবার পর হঠাৎ সামনে দেখতে পেলাম সেই কামানের মতো টেলিভিশনের ক্যামেরাটি চাকার ওপর চলতে চলতে আমার সামনে এসে গেল। তারপর ক্যামেরাটি ঘুরিয়ে শ্রোতাদের ছবি তোলা হতে লাগল। এই সব ব্যাপার দেখে আমার গানও মাঝপথে থেমে গেল এবং হারমোনিয়ামে গানের প্রথম লাইনটি বারবার বাজাতে লাগলাম; সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রীরাও আমার হারমোনিয়াম বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের বাদ্যযন্ত্রগুলিও বাজাতে লাগলেন। গান বন্ধ দেখে শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনের আওয়াজ উঠতে শুরু হল। সেই আওয়াজ শুনে এবং আমার গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে টের পেয়ে, ক্যামেরাম্যান ভদ্রলোকটি পিছন ফিরে যেই আমার দিকে তাকালেন অমনি তাঁর দিকে আমার বাঁ হাতটি বাড়িয়ে গেয়ে উঠলাম—"কী রঙ্গ তুমি করিলে।" তক্ষুনি শ্রোতাদের উচ্চহাসিতে প্রেক্ষাগৃহটি প্রায় ফেটে যাচ্ছিল। ক্যামেরাম্যান সাহেব খুব যেন অপ্রস্তুত হয়ে ক্যামেরাটি নিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

আমি তখন তাঁকে হাত দেখিয়ে ওই জায়গাতে থাকতেই ইশারা করে জানিয়ে দিলাম। ওই গানটি শেষ হবার পর আরো কয়েকটি গান গেয়ে নমস্কার করে যেই উঠতে গেলাম অমনি স্লোগান দেবার মতো অনেকেই চীৎকার করে বলে উঠলেন, "ইংরেজী গান, ইংরেজী গান।" আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলাম কিন্তু কে শোনে? অগত্যা আবার বসতে হল। মাইকে বললাম, "জামিলসাহেব, এইবার আপনের কামান-টামান হাটান আমি অখন এ্যাংরাজী গান গামু।" জামিলসাহেব কোত্থেকে ছুটে এসে আমায় হাতের ইশারায় গাইতে বললেন। পূরবী মুখার্জিকে ডেকে পাশে বসালাম এবং "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" গানটি গাইতে বললাম, আর শ্রোতাদের বললাম পূরবীর গানের পর ওই গানের রবীন্দ্রনাথের নিজের ইংরেজী অনুবাদ আমি গেয়ে শোনাব। পূরবীর গানের পর আমি ইংরেজী অনুবাদটি গাইলাম—"It deeks me only to mock me this jewelled chain of mine"

তারপর আর কোনো গান গেয়েছিলাম কিনা আমার মনে পড়ছে না।

গান শেষ হবার পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে বাইরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বেশ একটু মোটাসোটা লম্বা লোক, পাঞ্জাবি ও লুঙ্গিপরা, মাথায় সাদা মুসলমানী টুপি লাগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করে বলে উঠলেন, "হোয়াট এইজ হ্যাভ ইউ?" (what age have you ?) আমি জিজ্ঞেস করলাম "আপ পাকিস্তানী হ্যায় না বাঙালী হ্যায়?" উনি হেসে বলে উঠলেন, "না, না, আমি বাঙালী।" জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বললেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, "আপনে যে ভিৎরে এ্যাংরাজী গান গাইলেন হেই লাইগ্যা আমারও

আপনার লগে একটু এ্যাংরাজী কওনের Sawkh হইল।" হেসে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী করেন ?" উনি বললেন, উনি একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, ট্যাকসি তাঁর নিজেরই, আমাকে এবং আরো কয়েকজনকে হোটেল পৌঁছে দেবার ভার তাঁর ওপরে দেওয়া হয়েছে। উনি আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর গাড়িতে বসিয়ে দিলেন। অন্যরা অন্যান্য গাড়িতে উঠলেন। আমি ড্রাইভার-সাহেবের পাশেই বসেছিলাম। গাড়িটি কিছুক্ষণ চলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ড্রাইভারসাহেব, আপনি এই ইংরেজী ভাষা শিখলেন কোনখান থেকে ? উত্তরে তিনি বললেন, "আমাগো এ্যাংরাজী হইল খাল-পার হওনের এ্যাংরাজী, শিখন লাগে না।" জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা আবার কি ?" তিনি বললেন, "এইডা বুঝলেন না ? ধরেন আপনে আর আমি হাইট্টা যাইতাছি, দুইজন বিলাতী সাহেবও আমাগো লগে হাইট্টা চলছে ; আমাগো সামনে একটা খাল পড়ল, খালে পানি কম। কিন্তু পার হইয়া যাওন লাগব। আপনে আর আমি স্যাণ্ডল জুড়া হাতে লইয়া লুঙিখান হাডুর উপরে তুইল্যা সিধা খাল পার হইয়া যামু, কুনু অসুবিধা নাই। আর সাহেবরা কী করব ?—সাহেবগো জুতা খুলন লাগব, মুজা খুলন লাগব, বাদে ভাজ কইরা হাডুর উপরে তুলন লাগব ; তার বাদে খাল পার হইব। পেনটুল কত অসুবিধা তাগো। আমি যে এ্যাংরাজী কইলাম হেইডা আপনের বুঝনের কুনু অসুবিধা হইছে ?" আমি হেসে বললাম 'একদম না।" উনি বললেন, "ওইডাইত খাল পার হওনেব এ্যাংরাজী —এই এ্যাংরাজী শিখন লাগে না।" মনে মনে ভাবলাম বহুবৎসর আগে ঢাকা শহরের ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ানরা রসিকতার জন্য বিখ্যাত ছিল ; এখন দেখলাম ঢাকার ট্যাক্সি ড্রাইভাররাও সেই সব রসিকতার ব্যাপারে কোনো অংশেই কম নন।

কলকাতায় ফিরে আসার কয়েকদিন পরে হঠাৎ হেমন্ত মুখার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমায় দেখেই হেসে বলে উঠল, "জর্জকাকা, আপনি ঢাকায় কী সব বলে এসেছেন—জামিলসায়েব, আপনার কামান-টামান সব হাটান?" জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি করে জানলে? হেমন্ত বলল সে নাকি কয়েকদিন আগে ঢাকায় গান গাইতে গিয়েছিল, সেখানে টেলিভিশনে আমার ওই সব ব্যাপার দখান হচ্ছিল---সে নিজে দেখে এসেছে।

১৯৭৩ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর আবার আমায় গান গাইবার জন্য ঢাকা যেতে হয়েছিল। সেবার ছিলাম হামিদা আতিকের বাড়িতে। ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতা ফিরে আসি।

আমার বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সঙ্গে পত্রবিনিময়

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর কাছে ২২।১১।৭২ তারিখে একটি ইংরেজীতে লেখা চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে বাংলায় লেখা একটি বাদ্যযন্ত্রের তালিকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশ ছিল। সেই চিঠিখানার একটি প্রতিলিপি রেকর্ডিং কোম্পানী আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কবে পাঠিয়ে ছিলেন তা আমার মনে পড়ছে না।

সেই চিঠির প্রতিলিপি :

(TRUE COPY)

VISVA-BHARATI MUSIC BOARD

10, PRETORIA STREET, CALCUTTA—16

REGISTERED

Date 22. 11. 72

MB/261

M/S.Hindustnan Musical Products Ltd.

6/1 Akrur Datta Lane,

Calcutta—12

Dear Sirs,

It has been noticed for some time past that there is a growing tendency amongst the artistes to make use of

interlude music at the time of recording Rabindra Sangeet by taking help of various types of mcsical instruments and also foreign tunes during recital of song which sound discordant to the ear and also militates against the true spirit of the songs. By doing so, sometime it so happens, that the interlude music gains precedence over the original tunes Rabindra Sangeet thereby subduing the real flavour of rendering of the songs,

It has already been imperssed upon you the importance of making use of subdued music in order to maintain the style and mode of Rabindra Sangeet but in the absence of any method for eliminating the influence of the Western style ot music in the recorded songs by determining the basic requirements ofmusical accompaniments no suitable arrangements could be made so far in the matter.

As already commuicated to you that the basic requirements as indicted in the attached sheet are to be strictly adhered to at the time of recording of Rabindra Sangeet in future.

Your co-operation in the matter is earnestly solicited.

Yours faithfully

Sd/............

Hony. Secretary

SK/— Visva-Bharati Music Board

এই চিঠিখানার সঙ্গে বাংলা ভাষায় লেখা একটি কাগজও গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। সেই কাগজটিতে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার

জন্য কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে হবে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই কাগজটির একটি প্রতিলিপি নিচে দিলাম :

রবীন্দ্রসংগীতের উপযোগী যন্ত্র

১। (ক) এস্রাজ, বাঁশী, সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা, বেহালা, দোতার, একতারা, বাসবেহালা বা অরগান।

(খ) পাখোয়াজ, বাঁয়াতবলা, খোল, ঢোল ও মন্দিরা।

২। প্রতি গানের মূল আবেগটির প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুকূল আবহসংগীত যন্ত্রে রচনা করে, আরম্ভে এবং যেখানে গায়কের কণ্ঠের বিশ্রাম প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করতে হবে।

৩। যে কটি যন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, গানের সঙ্গে তার সব কটিকেই বাজান যেতে পারে কিন্তু কোন যন্ত্রটি কিভাবে আবহসংগীতে বাজাবে সংগীত রচয়িতাকে তা স্থির করতে হবে গানের প্রতি ছত্রের ভাবটির প্রতি লক্ষ্য রেখে।

৪। আবহসংগীত গায়কের গলার শব্দকে ছাড়িয়ে যাবে না কখনো। কণ্ঠের বিশ্রামের সময় বা গান আরম্ভের পূর্বে যখন যন্ত্রে আবহসংগীত বাজবে তখনও এই দিকটার প্রতি বাজিয়েরা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন।

৫। তালযন্ত্রের সঙ্গতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তালের ছন্দ বা বোল যেন কথার ছন্দ ও লয়ের বিপরীত না হয়। অর্থাৎ, দ্রুত ছন্দের গানে যেমন দ্রুত লয়ের ঠেকার প্রয়োজন ঢিমালয়ের গানে তেমনি ঢিমালয়ের ঠেকার প্রয়োজনকে মানতেই হবে।

৬। কথার উপরে ঝোঁক দিয়ে অনেক গান গাইতে হয়। এই সব গানের সঙ্গে সঙ্গতের সময় তালবাদ্যেও কথার ছন্দের অনুকূল ঝোঁকে প্রকাশ পাওয়া দরকার। তাতে গানের ভাবের সঙ্গে কথার ভাবের সঙ্গতি থাকে।

রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত নির্দেশগুলি কে বা কারা দিয়েছেন আমি জানি না। তবে বেশ সহজেই বোঝা যায় যে, যিনি বা যাঁরা ওই নির্দেশগুলি জারী করেছেন তাঁর বা তাঁদের রেকর্ডিঙের ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। উপরে উল্লিখিত ৪নং নির্দেশটি পড়লে মনে হবে রেকর্ড করার সময় যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজান, আবহসংগীত বাজাবার সময় বাজিয়েদের ওপরেই সমস্ত দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। উপর্যুক্ত নিয়ামকরা জানেন না যে এই ব্যাপারে বাদ্যযন্ত্রীদের কোনো দায়িত্বই নেই। রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ঘরে বসে রেকর্ডিং যন্ত্রের নানা ধরনের চাবিকাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কণ্ঠের এবং বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রয়োজন হলে ইঞ্জিনিয়ার ইশারা করে অথবা নিজে এসে নির্দেশ দিয়ে যান। ৫নং নির্দেশটিতে তালযন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা পড়ে মনে হবে সেগুলি খুব বিশেষ চিন্তাপ্রসূত নয়। তালযন্ত্র বিশেষ করে তবলা বাজাবার ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল এবং খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার। তাই হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী যখন এই চিঠিগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন ভেবেছিলাম এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করাই ভাল। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীত আর রেকর্ড করবো না বলেই স্থির করেছিলাম।

ইতিমধ্যে ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বরে আমি নিজেই দুটি গান লিখে এবং তাতে নিজেই সুরারোপ করে 'গুরু বন্দনা' নাম দিয়ে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়ে দিলাম। রেকর্ডটি যাতে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে কোম্পানীকে অনুরোধ জানিয়ে এলাম। গান দুটির কথা ছিল :—

১। গুরুদেব, গুরুদেব, তোমায় গুরু বলে আমি জানি
তোমায় নত হয়ে আমি মানি।

শিশুকালে বসে মায়ের কোলে,
মায়ের মুখে তোমার গানের মর্ম কিছুই বুঝিনি তখন
শুধু চেয়ে থাকতাম তাঁর মুখের পানে।
তুমি তো জান যে গানের পরশ লেগেছিল মোর প্রাণে,
করিনি তো হেলা, কত মন্দির ভরেছি তোমার গানে
শুনায়েছি কত মাঠে প্রান্তরে তোমার অমৃতবাণী,
তোমায় গুরু বলে আমি জানি।
　　তোমার গানের মন্দিরে আমি সারা জীবন ধরে
　　তোমার গানের মালা গেঁথেছি দিবস রাত্রি ধরে
প্রহর শেষের ঘণ্টা যখন বাজছে আমার বুকের মাঝে,
তোমার গানের মন্দির দ্বারীর হুঙ্কারধ্বনি শুনি বাজে।
আমার প্রবেশ নিষেধ করি দুয়ার ওরা যে দেয় টানি,
ওদের কঠিন তিরস্কার অর্থহীন তা জানি জানি।
তাই বাহির দুয়ারে বসে সবারে,
শুনাই তোমার বাণী, তোমায় গুরু বলে আমি জানি॥

২। বিশ্ববীণার কলধ্বনি তোমার মনোবীণার তারে তারে
জাগাল যে কতগান, তারি প্রতিধ্বনি ভেসে এসে
ঝংকারিল আমারি প্রাণ, ঝংকারিল আমার প্রাণ।
মনে নানা রঙের রসে তুমি রোপিলে তোমার গানের চারা,
আজকে দেখি প্রাণের সাড়ায় ফুলেফলে রঙিন বেশে
দাঁড়ায় তারা, আহা দাঁড়ায় তারা।
তোমায় যারা ভালোবাসে
বিলাই সে ফুল তাদের কাছে,
তারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে তোমারি সে দান
ঝংকারিল আমারি প্রাণ।

মনে পড়ে একদিন
তোমারি অর্ঘ্য সাজানু আমি তোমারি রচিত গানে,
মনে আছে সেই দিন
স্নেহমাখা চোখে চেয়েছিলে তুমি আমার পানে।
তোমার জ্ঞানী যত প্রথার দোহাই দিয়ে
আজ রচিছে বিধান নব নব,
তোমার গানের রসের ধারা
দম্ভভরে তারা করে সারা,
কী আর কব আমি কী আর কব ?
প্রাণের চেয়ে করে নিয়মকে বড়
তুমি ওদের ক্ষমা করো।
ওরা জানে না, ওরা বোঝে না
ওদের প্রাণে তো নাই কোনো গান
ব্যথায় ভরে আমার প্রাণ ॥

এই গান দুটি কলকাতার কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমি গেয়েছিলাম এবং যতদূর মনে পড়ে, জামসেদপুরেও একটি রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানে আমার গানের আগে শ্রোতাদের বলেছিলাম যে প্রথমে 'গুরুবন্দনা' করে পরে আমি রবীন্দ্রসংগীত শোনাবো। এই গান দুটি যে রেকর্ড করেছিলাম সেই খবরও আমি অনেককে দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করেও দেখলাম গানদুটির রেকর্ড হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী প্রকাশ করেন নি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি আমার রেকর্ড, রেকর্ডিং কোম্পানী প্রকাশ করেননি—এ ধরনের ঘটনা কখনও ঘটেনি। এই ব্যাপারেই প্রথম ব্যতিক্রম হল। এই ঘটনার পিছনে কোনো গোপন হস্ত কাজ করেছে কিনা আমি জানি না। তাই একদিন রাত্তিরে

রবীন্দ্রনাথের আত্মার কাছে আমার আন্তরিক নিবেদন জানিয়েছিলাম, তাঁর আত্মাকে বলেছিলাম—"গুরুদেব, আপনার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত আমার বন্দনা গান দুটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যদি কোনো/গোপন হস্ত বাধা সৃষ্টি করে থাকে তাহলে আপনি তাঁকে দয়া করে ক্ষমা করুন।"

শুনেছি ১৯৯১ সনে নাকি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে—কি হবে জানি না—তখন হয়তো আমি ইহলোকে থাকব না। আমাদের রেকর্ড কোম্পানীকে অনুরোধ করব তখন যেন আমার বন্দনা গান দুটির রেকর্ড প্রকাশ করা হয়।

তারপর থেকে আমি অনেক ভেবেছি। শেষে মনস্থির করলাম বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড রেকর্ড করার ব্যাপারে যে কতকগুলি অযৌক্তিক নতুন নিয়মকানুন জারী করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাতেই হবে। এই ব্যাপারে মিউজিক বোর্ডের Hony, Secretary শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। তার প্রতিলিপি নিচে দিলাম :

174E, Rashbehari Avn, Cal-20
১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অত্যন্ত ব্যথাভরা হৃদয় নিয়ে আপনাকে একটি নালিশ জানাবার উদ্দেশ্যেএই চিঠি। হয়তো আপনার অনেক মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করছি—সেজন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছি। আশা করি আপনি আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত দেবার মত অনেকেই আজ জীবিত নেই। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই বোধ হয় সব চাইতে প্রবীণ। অনাদিদাও সেদিন চলে গেলেন। সুতরাং আপনাকে ছাড়া আমার মনের কথা জানাবার

মত কাউকেই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার গাওয়া গানও আপনি বহু বৎসর যাবৎ শুনে আসছেন।

ব্রাহ্মপরিবারে জন্ম হয়েছিল বলে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রসংগীত চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের রসে মনটা আমার রসিয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সনে কলেজের পড়ুয়া হয়ে কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজের পাল্লায় পড়ে বহু ব্রহ্মসংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীত আমায় শিখতে এবং গাইতে হয়েছে। যাঁদের কাছে শিখতাম তারা আজ আর কেউ জীবিত নেই। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নানা উৎসবের গানের মহড়ায়ও আমার যাতায়াত ছিল। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সে চাকুরি করার সময় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সূত্রে পাম অ্যাভিনুর বাড়িতে স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁর কাছে বহু গান শুনেছি এবং শিখেছি। আমার মনে আছে পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিয়ে তিনি নানা ধরনের Experiment করতেন—ছাপানো স্বরলিপির সামান্য অদলবদল করে আমাদেরকে শেখাতেন এবং আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন। কতকগুলি রবীন্দ্রসংগীতের Harmony করা সুরে তিনি আমাদেরকে দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে গাইয়েছিলেন: "আমি চিনি গো চিনি তোমারে" গানটির Harmonised স্বরলিপি তৈরি করে 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। ঐ গানটি Harmonised ভাবে বহু অনুষ্ঠানে আমাদের গাইতে হয়েছে। তাছাড়া রথীদা এবং চারুবাবু যে আমার গান অত্যধিক পছন্দ করতেন তাতো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। অনাদিদার দৌলতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে খুশি করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এতো কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে—বাল্যকাল থেকে শুরু করে নানা ধরনের রবীন্দ্রসংগীত নানাভাবে গাইতে গাইতে এবং রেকর্ড করে আমার জীবনের তেষট্টি বৎসর কেটে গেল—কাজে কাজেই যতই বিনয় করি না কেন—এটুকু না বলে

থাকতে পারছি না যে সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার ব্যাপারে আমার বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার রেকর্ড করা গানগুলি যে ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীত রসিক ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে তাতে আমার মনে এইটুকু বিশ্বাস জন্মেছে যে নিছক সস্তা রুচি পরিবেশন করে তা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের এবং নবীনদের অকুণ্ঠ ভালবাসা আমি সারাজীবন পেয়েছি। কিন্তু এটুকুও না বলে থাকতে পারছি না যে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী এবং সুরের সমন্বয়ের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ গায়নশৈলীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম গভীরভাবে উদ্‌ঘাটিত করে ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও যে অসংখ্য রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগী রয়েছেন তাঁদের Intellect এবং Emotionকে গভীরভাবে নাড়া দিতে আমি সক্ষম হয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েক বৎসর আগেকার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কলকাতার বেশ নামজাদা কয়েকজন উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পীদের একটি আসরে একজন বিদেশী (য়ুরোপীয়) Composerকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বিদেশী Comopserটি তাঁরই রচিত একটি যন্ত্রসংগীতের অর্কেস্ট্রার tape করা রেকর্ড শোনালেন। বাজানো শেষ হয়ে গেলে অনেকেই নানা ধরনের প্রশংসার বাণী বর্ষণ করলেন। একজন নামকরা বাঙালী যন্ত্রশিল্পী এক কোণায় বসে নীরব হয়ে কী যেন ভাবছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তিনি মুখ খুললেন—বাজনাটি শুনে তাঁর মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হল সেটা বলতে শুরু করলেন। তাঁর কথাগুলি হুবহু আমার মনে নেই—তবে তিনি যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ সংক্ষেপে হল—বাজনা শুনে তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন দল বেঁধে কোনো এক মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ তুমুল ঝড় উঠল—ঝড়ের বেগে বালুকণা উড়তে শুরু করল—চোখ প্রায় অন্ধ—কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে ঝড় থেমে গেল—আবার তাঁরা চলতে লাগলেন—জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি···অপূর্ব শান্ত পরিবেশ—তাঁর কথা শেষ না হতেই সেই বিদেশী Composer হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন—"আপনি ঠিক বলেছেন—

আমার এই Compositionটির নাম CARAVAN।" আমি অবাক! সেই বাঙালী যন্ত্রশিল্পীটি হলেন রাধিকামোহন মৈত্র। তিনি নিজে যন্ত্রী—তাই বাদ্যযন্ত্রের ভাষা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। রাধিকাবাবুকে কোনোদিন পাশ্চাত্যসংগীত নিয়ে চর্চা করতে দেখিনি—শুনিওনি। অথচ য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির ভাষা তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করেছিল তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। রাধিকাবাবুর হয়তো এই ঘটনাটির কথা মনে নেই কিন্তু সেদিন ঘটনাটি আমার মনে যে দাগ কেটেছিল তা কোনদিন মলিন হবে না। সেদিন আমার মনে হয়েছিল, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ এবং বিভিন্ন সুর আমার মনেও তো বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করে—যেমন সানাই, বাঁশী অথবা অন্য কোনো তার-যন্ত্র—কীভাবে এবং কেন এই আবেগ সৃষ্টি হয় তা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর পর থেকে আমি অনেক ভেবেছি—রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা আমাকে প্রেরণা যোগাল—তিনি বলেছিলেন—"য়ুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বর-সংগতি আছে আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কিনা। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়…না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না—ওটা য়ুরোপীয়। কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয় তবে একথাও বলিতে হয় যে—যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয় অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে।…

"ইহার অভাবে আমাদের সংগীতে যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি, তবে তাহাতে কেবল মাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে। তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে **আমাদের গানে** হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে।…

"যাইহোক আমাদের সংগীতের পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাঁকা আছে, এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্‌ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বাভাবিক সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল, এই একটি আবিষ্কারের

ক্ষেত্র তাদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক কাল হোক, এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।"

লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি কিন্তু ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীকে এই ব্যাপারে নানা ধরনের Experiment করতে আমি দেখেছি। রাধিকাবাবুর কথাগুলি আমায় একটা ভাবনার যোগান দিয়ে দিল। পাশ্চাত্যসংগীত সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছি, কণ্ঠের এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন ধ্বনি এবং সুর মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করে তাতে কোনো দেশকালের নিয়ম মানে না। রবীন্দ্রসংগীতের নিজস্ব একটি আবেগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে—সেই ক্ষমতাটিকে ধার দিয়ে আরো বেশী জোরালো করে শ্রোতাদের Intellect এবং Emotion গুলিকে আরো গভীরভাবে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে, আমার রেকর্ড করার সময় দেশী বিদেশী নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রগুলির ধ্বনির সাহায্য নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করেছি। ঐ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি আমার নিজের মনে যে আবেগ সৃষ্টি করে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনের মতো ছাঁদে সুরের জাল বুনে গানগুলির সুররূপের কাঠামো জখম না করে ঐ সব বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য আমি নিয়েছি। অকপটে স্বীকার করতে আমার কোনো বাধা নেই যে গানগুলি গাইবার সময় Expression-এর স্বাধীনতা আমি নিয়েছি—কারণ রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্রের সুর সাজিয়ে গানের রূপ ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে আমি কতখানি সফল হয়েছি তার বিচারের ভার শ্রোতাদের ওপর—তাদের Verdict আমি মাথা পেতে গ্রহণ করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমি সম্পূর্ণ সফল হইনি—তাতে আমি দুঃখ পেয়েছি—অবশ্য সব Expriment-ই যে সফল হবে তা জোর করে বলা যায় না। এটা ঠিক যে এতে আমার অভিজ্ঞতা বাড়লো।

প্রশ্ন করতে পারেন—রবীন্দ্রনাথের গান তো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ—ঐ সব বিদেশী যন্ত্রের সাহায্য নেবার কী প্রয়োজন? তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে—মিউজিক বোর্ড রবীন্দ্রসংগীতের উপযোগী বাদ্যযন্ত্রের যে তালিকা দিয়েছেন

ঐ তালিকাতে যে সব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে সেই যন্ত্রগুলিরও বা কী প্রয়োজন ?

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে একটা বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টায় আমি কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম—হঠাৎ বাধা পেলাম ১৯৬৯ সনে। আমার দুটো গানের রেকর্ড বোর্ডের অনুমোদন পেল না। কারণ দেখানো হল—

১। "পুষ্প দিয়ে মারো যারে"—"Excessive music accompaniment hampers the sentiment of the song."

২। "তোমার শেষের গানের" The tempo the song is too quick, music accompaniment is too much and the song itself is not sung according to notation."

লক্ষ্য করে দেখবেন notation-এর ব্যাপারে কী ভুল হয়েছে তার উল্লেখ নেই।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী আমার মতামতের জন্য অনেকদিন পীড়াপীড়ি করেছিলেন এই ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীকে জানাতে হয়েছিল যে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার এবং রেকর্ড করার ব্যাপারে আমার কর্তব্যজ্ঞান এবং দায়িত্বজ্ঞান অন্য কারোর চাইতে কম আমি তা' বিশ্বাস করি না। তাছাড়া মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকটির মতামত নিতান্তই Subjective—অতএব এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রেকর্ড করা বন্ধ করতে হল।

১৯৭০ সনের শেষের দিকে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর মালিক চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ঐ সময়ে আরও কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিলাম—সেই গানগুলির মধ্যে কয়টি অনুমোদন লাভ করেছে তা, আমার জানা নেই।

কিছুকাল পরে রেকর্ড কোম্পানী আমায় জানালেন যে রেকর্ড করার ব্যাপারে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড নূতন কতগুলি নিয়ম প্রবর্তন করেছেন! যে নূতন নিয়মগুলি প্রবর্তিত হয়েছে তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

কার অথবা কাদের ভাবনাপ্রসূত এইসব নিয়ম তা' আমার জানার কথা নয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ভাবনা দিয়ে ভাবিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীতের জাত বাঁচানো যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে পারতেন না। কারণ আমি জানি তিনি দিলীপবাবুকে বলেছিলেন—"গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী করে? তাই, আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেইভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না।"

সুতরাং কার কথা মেনে চলব? রবীন্দ্রনাথের—না যাঁরা নূতন নিয়মগুলি করেছেন তাঁদের?

এবার আমাদের রেকর্ড কোম্পানীকে লেখা মিউজিক বোর্ডের ২২।১১।৬২ তারিখের চিঠির থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি—"there is a growing tendency among the artistes to make use of interlude music at the time of recording Rabindra Sangeet by taking help of various types of musical instruments and also foreign tunes during recital of songs which sound discordant to the ear and also militatas against the true spirit of the songs." সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই Subjective—"discordant to the ear" সব ক্ষেত্রে সত্য হয় না—কানে কানে ভেদাভেদ থাকবেই—সব কান একরকম হয় না। কোনটা true spirit of the song তা জানতে, যে সব শ্রোতা নিজের পয়সা খরচ করে রেকর্ড কিনে আনন্দ পান, তাঁদের সবারই যে একেবারেই রবীন্দ্রসংগীতের রস আস্বাদন করার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা নেই এমন কথা বলতে পারি না। শ্রোতাদের গ্রহণ এবং বর্জন দিয়েই প্রমাণিত হয় কোনটা ভালো কোনটা মন্দ।

পরের প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে—

"It has already been impressd upon you the importance of making use of subdued music in order to maintain the

style and mode of Rabindra Sangeet but in the abgence of any method for eliminating the influnce of the Western style of music in the recorded songs by determining the basic requirements of musical accompaniments, on suitable arrangements could be made so far in the matter.

As already communicated to you that the basic requirements as indicated in the attached sheet are to be strictly adhered to at the time of recording of Rabindara Sangeet in future."

"Style and mode of Rabindra Sangeet" কথাগুলি নিতান্তই অর্থহীন—কারণ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসংগীতের ওস্তাদদের মধ্যেই এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ ছিল এবং এখনও বোধহয় আছে। কলকাতায় যতগুলি রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদেরা বলেন বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত কাকে বলে তাঁরাই শুধু জানেন, কিন্তু দেখা যায়, প্রত্যেকেরই গাইবার এবং গান শেখাবার ধরন আলাদা। সুতরাং আসল নকল বোঝা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো মাপকাঠির ব্যবস্থা করে যান নি।

কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজী ভাষায় লিখিত নির্দেশের শেষের অংশটুকু পড়লে মনে হয় মিউজিক বোর্ডের যত ক্রোধ সব যেন বাদ্যযন্ত্রের ওপর। বোর্ড বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে রবীন্দ্রসংগীতকে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় কী কী বাদ্যযন্ত্র রবীন্দ্রসংগীত উপযোগী এবং সেই যন্ত্রগুলি কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরসংগতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কথা আমি আগে একবার উল্লেখ করেছি। সেই ব্যাপারে তাঁর আরো সুস্পষ্ট মতামত তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন নানা লেখায়। কয়েকটি উক্তি নিচে উদ্ধৃত করলাম।—

১। "আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই য়ুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়া আছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্র পার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনই হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না। নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব, কোনখানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব সে শক্তি আমাদের নাই। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। **আমার বিশ্বাস —সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে।** তাহাকে প্রাচীন দস্তুরের লোহার সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙাইতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই **আমাদের সংগীতকে** আমরা সত্য করিয়া, বড় করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।"

২। "বঙ্কিম আনলেন সাত-সমুদ্র-পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি বিজয়-বসন্ত লায়লা-মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতি কালের সঙ্গে তাঁর মালা-বদল হয়ে গেল. তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে ?"

৩। "যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড় করে মানে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী। তারা এখনো বলে—এ সমস্তই ভুয়ো, বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে একথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।"

৪। "সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয়, এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ

শক্তি পাবার জন্য বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই।"

৫। "সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন-লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে।"

৬। "কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে বলতে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না— তাহলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।"

৭। "আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌচেছে। কিন্তু সংগীতে পৌছয়নি। সেই জন্যেই আজও সংগীত জগতে দেরী করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে।"

৮। "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী- নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।"

সুতরাং Influence of Western music সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কী ধারণা তা' আমাদের জানা। একথা আজ সবাই জানেন যে জ্যোতিদাদার পাশ্চাত্ত্য কায়দায় পিয়ানো বাজানার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের জন্ম হয়েছিলো। তাছাড়া, অনেকেই জানেন যে অনেক বিদেশী সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর অনেক গান বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার প্রথম যুগের গানের রেকর্ডগুলি শুনলে দেখা যায় যে তখন শুধু হারমনিয়াম অথবা অর্গ্যান বাজিয়ে গান রেকর্ড করানো হত। তখনকার দিনে রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে শিল্পীদের এবং উদ্যোক্তাদের মনে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না বলেই তখনকার দিনে অন্যান্য গান রেকর্ড

করার বেলাতেও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের কোনো বিশেষ একটি রূপ ধরেনি—সবই মামুলী ধরনের হত। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে আর্টের সবগুলি ক্ষেত্রে নূতন নূতন উপলব্ধির তাগিদে নূতন নূতন উদ্ভাবনের পথে মানুষ চলতে শুরু করল। রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে বিশ্বযাত্রার তালে তালে তাল মিলিয়ে। পঞ্চাশ বৎসর আগে যেরূপে এবং ভঙ্গীতে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া অথবা রেকর্ড করা হত, বর্তমান কালের রবীন্দ্রসংগীতের চেহারার এবং ভঙ্গীর সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। কালের গতিতে সেই চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও পরিবর্তন হবে না তা' কি কেউ জোর করে বলতে পারে?

একদা রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন তাঁর গানই নাকি টিকে থাকবে। কিন্তু "আমাদের মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা দিয়ে ঘিরে রাখলে এবং পলতেয় করে ফোঁটা ফোঁটা নিয়মের বিধান খাইয়ে" রবীন্দ্রসংগীতকে টিকিয়ে রাখা যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে এবং বলতে পারেন নি। তিনি বরঞ্চ বলেছিলেন—"সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্‌স্‌প্রেশনের কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে।" তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলায় গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে, তার কারও পাথরজমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ গায়ককে এবং শ্রোতাকেও Expression-এর ব্যাপার যে বিপুল সাহায্য করে তা' শুধু অনুভূতির ব্যাপার—বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায় না। পাশ্চাত্য সংগীত বা য়ুরোপীয় সংগীত সম্পূর্ণ বিদেশী—তাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনেক বৎসরের সাধনার প্রয়োজন হয়—বুঝতে গেলেও তাই প্রয়োজন। মিউজিক বোর্ডের তালিকাভুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যতীত অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র রেকর্ড করার সময় ব্যবহার করলেই Western Influenceএর উৎপাত এসে জুটবে এমন একটি অদ্ভুত ধারণার পেছনে কোনো ধীমত্তার পরিচয় আছে কিনা আমি জানি না। যাঁরা Western

musicএর পণ্ডিত, ব্যাপারটি তাঁদেরও বোধগম্য হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

যাইহোক—যে রবীন্দ্রনাথকে আমার পিতামাতা গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন, যে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা আমার চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে কোনো মূল্য না দিয়ে এবং তার নির্দেশ অমান্য করে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঝারি কর্তাদের নির্দেশ এবং বিধিনিষেধ মেনে আর রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই—প্রবৃত্তিই নেই। এই ব্যাপারে যুক্তিহীন কতগুলি নিয়ম যতদিন বলবৎ থাকবে ততোদিন নিজেকে দূরে সরিয়েই রাখব। আমি দেখেছি হালে কয়েকজন তরুণ রবীন্দ্রসংগীত গায়কগায়িকা অতি সুন্দর গাইছেন—মনে হয় তাঁদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে—লক্ষ্য করেছি তাঁরাও এ ব্যাপারে বেশ ভাবনাচিন্তা করেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই নিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মতো সাহস ও ক্ষমতা তাঁদের নেই। আমার একথাও মনে হয় যে Recordingএর ব্যাপারে technical খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অবকাশ ও সময় আপনার নেই। তাই আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে আপনি অনুগ্রহ করে যথার্থ সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতরসিকদের আহ্বান করে, তাঁদের আলাপ আলোচনার আলোকে এমন একটি ব্যবস্থা করুন যাতে আমাদের অতি প্রিয় সবুজ ও সজীব রবীন্দ্রসংগীত শুকনো কাঠ না হয়ে যায়।

এতোদিন আমার মনের কথাগুলি কারো কাছে খুলে প্রকাশ করিনি। আপনার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমি পেয়েছিলাম বহু বৎসর আগে "তুমি রবে নীরবে" গানটির অনুমোদনের ব্যাপারে। তাই আপনার কাছে আমার মনের কথা সব জানাতে সাহস পেলাম। দয়া করে কোনো অপরাধ নেবেন না। শেষ করবার আগে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণীর উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না—তিনি লিখেছিলেন—"কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরী হইলেও নয়। কেননা

মনের বেগই সব চেয়ে বড় বেগ। তাকে ইন্‌টারন্‌ করিয়া যদি সলিটরি সেলের দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবল মাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন-সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়, যারা ভূমাকে মানে, তারা সৃষ্টি করিতেই চায়, দমন করিতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড় যারা তারা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর—মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা কিছু সবুজ তা হলদে হইয়া যায়, যা কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।"

শ্রদ্ধাবনতচিত্তে প্রণাম জানাই—ইতি
দেবব্রত বিশ্বাস

শ্রদ্ধেয় শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
কলিকাতা

এই চিঠিখানা আমি নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাসভবনের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম। আমার এই চিঠির উত্তরে তিনি ১৯৭৪ সনের ১৮ই ফেব্রুআরি তারিখে আমায় একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠিখানার প্রতিলিপি দিলাম :

2B, Abhoy Goho Road
Calcutta ১৮।২।১৯৭৪

কল্যাণীয়

প্রিয় জর্জ,

তোমার চিঠি পরশু শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ পাইয়াছি। তুমি ত জান আমি তোমার গান শুনতে ভালবাসি। গত পঁচিশে বৈশাখ তুমি জোড়াসাঁকোতে উপস্থিত ছিলে না। খোঁজ লইয়াছিলাম। কে যেন বলেছিল তোমার হাঁপানি হইয়া কষ্ট দিতেছে।

যাহা হউক আমি ত সব জিনিসটা জানি না। জানই ত সংগীত সমিতিতে Expertরা মতামত দিলে আমি শুধু record সম্বন্ধে চিঠিগুলি সই করিয়া দিই। এরপর মনে করছি কোন tape অনুমোদিত হলে নিজে শোনা প্রয়োজন হয়েছে; তবে আমার মতামতের মূল্য পাব কি? যাহা হউক এ বিষয়ে আমার কিছু করার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং একটু আলোচনার দরকার। দেখা করতে পারবে কি? আমাকে টেলিফোন করলে সময় এবং কোথায় তোমার দেখা করিবার সুবিধা জানলে ঠিক করা যাবে। (কিন্তু বলে রাখি—সেই সঙ্গে তোমাকে গানও শোনাতে হবে—কি বল তুমি)।

আমি ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর পূর্ণেন্দুবাবু—যিনি টেপ শোনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন এবং চিঠিপত্র খসড়া করেন—তাঁকে জানাব ঐ সংক্রান্ত কাগজগুলি যেন আমাকে দেখার জন্য পাঠাইয়া দেন।

আশাকরি ভাল আছ।

প্রীতিসম্ভাষণ জানিও।

ইতি

(স্বাক্ষর) নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রবাবুর চিঠিতে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার তিনি আমায় 'জর্জ' সম্বোধন করেছেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে শ্রদ্ধেয়-নৃপেন্দ্রবাবুর বয়েস আশী পেরিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি উপর্যুক্ত চিঠিখানা নিজের হাতে লিখেই আমায় পাঠিয়ে ছিলেন। চিঠির উত্তরে আমি যে চিঠি তাঁকে লিখেছিলাম তার প্রতিলিপিও দিলাম।

১৭৪ই, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু

কলিকাতা-২৯

২৭শে ফেব্রুআরি ১৯৭৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

খুব ভয় ছিল আপনি হয়তো আমার চিঠি পেয়ে খুব অসন্তুষ্ট হবেন! আপনার চিঠি পেয়ে আমার আর দুর্ভাবনা নেই।

আমার শরীরটা খুব ভালো নেই—গত কয়েক বৎসর যাবৎ এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে কখন যে শরীর অচল হয়ে পড়বে তা আগের থেকে কিছুই বোঝা যায় না। তাই আগের থেকে কিছু ঠিক করে বা plan করে কাউকে কথা দিতে ভীষণ ভয় হয়। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন—আমি নিশ্চয়ই দেখা করব কিন্তু কবে যেতে পারব তা আগের থেকে ঠিক করে আপনাকে জানিয়ে যদি সেদিন যেতে না পারি তাহলে নিজেকে অত্যন্ত দোষী মনে করে আরো ভীষণ কষ্ট পাব। সেজন্য ঠিক করেছি—কোনো এক ছুটির দিনে যদি শরীর ভালো থাকে এবং যদি কোনো সঙ্গী পাই, আপনাকে ফোন করে আপনার বাড়িতে হাজির হব। সঙ্গী ছাড়া একলা চলাফেরা করার মতো মনের জোর আর আমার এখন নেই।

আশা করি এতোদিনে পূর্ণেন্দুবাবুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেয়ে গিয়েছেন। লিখেছেন—অনহুমোদিত রেকর্ডগুলি আপনি নিজেই শুনবেন। কিন্তু এতে ব্যাপারটির একটি নিষ্পত্তি হবে কিনা আমি জনি না।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে নানা জানা-অজানা কারণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী রেকর্ড অনুমোদন করার ব্যাপারে ছিল আগেকার দিনে, এখন আর তা নেই—আবার সেই দৃষ্টিভঙ্গী ফিরে পাবার মতো কোনো ওষুধ আছে কিনা তা আমার জানা নেই।

মিউজিক বোর্ডের বর্তমান কালের পরীক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষকই নাকি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষালাভ করেছেন। শান্তিনিকেতনের পরিবেষ্টনের মধ্যে ওখানকার সংগীত-গুরুরা যেভাবে ভাবিত হয়ে তাঁদেরকে শিখিয়েছেন, ঠিক সেই ভাবেই ভাবিত হয়ে রেকর্ডগুলি তাঁরা শোনেন এবং বিচার করে থাকেন। আদালতের বিচারের মতো কোনো আইনের ধারা তো রেকর্ড অনুমোদন এবং বিচারের ব্যাপারে নেই। সুতরাং পরীক্ষকগণ যেভাবে ভাবিত হতে শিখেছেন সেই ভাবনা দিয়েই হয়তো বিচার করতে বসেন। তাছাড়া আর উপায় কি? যদি কোনো গান তাঁরা আগে না শিখে থাকেন তাহলে স্বরলিপির বই খুলে

বিচার করতে বসতেই হয়। সেই সময় যদি রেকর্ডের বাদ্যযন্ত্রগুলির ধ্বনি এবং সুর তাঁদের হৃদয়ের সূক্ষ্ম আবেগগুলিকে গভীরভাবে নাড়া দিতে থাকে তাহলে বিচারের ব্যাপারে যে মনোযোগের প্রয়োজন তা বিঘ্নিত হতে বাধ্য —তাই হয়তো বাদ্যযন্ত্রের প্রতি এতো বিদ্বেষ। এটা অবশ্যি আমার ব্যক্তিগত ধারণা—সত্যি না-ও হতে পারে। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে বোর্ডের পরীক্ষকগণ, সংগীত পরিবেশন করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উদার মনোভাবের পরিচয় হয়তো পাননি—অথবা পেয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের কোনো মূল্যই দিতে চান না বা পারেন না। গায়কের Expression এবং Interpretationএর স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপবাবুর আলাপ-আলোচনার কিছুটা আভাস আমার আগের চিঠিতে দিয়েছিলাম। আপনার অবগতির জন্য আরো কিছু যোগ করছি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী করে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। কারণ, গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। **তাই এক্‌স্‌প্রেশনের ভেদ থাকবেই**, যাকে তুমি বলছ ইণ্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বলছিলে বিলাতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম; বলতে হত; আমার গান সাহানা গাইছে। তোমার [illegible]র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই-যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গড়ে উঠেছে, এটা তো খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই তোমার স্বকীয় ঢঙে তুমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গাইলে যেভাবে, **আমার সুরের গঠনভঙ্গী রেখে এক্‌স্‌প্রেশনের যে স্বাধীনতা তুমি নিলে, তাতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি**। এ গান তুমি গ্রামোফোনে দিতে চাইছ, দিয়ো—আমার

আপত্তি নেই। কারণ এতে আমার সুররূপের কাঠামো (structureটি) জখম হয়নি। তোমার একথা আমিও স্বীকার করি, যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্‌স্‌প্রেশনে কম-বেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশীর মধ্যে তফাত আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে 'না' করতেই হবে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন এ ব্যাপারে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন? কে প্রতিভাবান, কে কম প্রতিভাবান আর কে গড়-পড়তা গায়ক তার বিচার এখন কে করবেন এবং কীভাবে করা হবে? আর, বিচার করতে গেলেই বিবাদ, বিদ্বেষ এবং পরস্পরের প্রতি ক্লেদক্ষেপণ শুরু হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী এখন আর নেই। অনাদিদার গোঁড়ামি ছিস সত্যি কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট উদারতাও ছিল। মনে আছে, অনেকদিন আগে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী সুপূর্ণার কচি গলায় একটি সুন্দর গান শুনেছিলাম—গানটির দুয়েকটি জায়গায় স্বরলিপির একটু ব্যতিক্রম ছিল—জিজ্ঞেস করে জানলাম ইন্দিরা দেবীর কাছে ও শিখেছে—তক্ষুনি গানটি ওর কাছে শিখে নিলাম—পরে অনাদিদাকে শুনিয়েছিলাম—তিনি দারুণ খুশী হয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি মজার ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। ১৯৬৪ সনে আমার একটি রেকর্ড করা গান—"এসেছিলে তবু আস নাই" বোর্ডের অনুমোদন পেল না—ভুল গাওয়া হয়েছে বলা হল। পরে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়কে যখন গানটি শোনানো হল তখন তিনি লিখলেন—

| ম
জ্ঞা´ -ঋ´
চ ন্ | এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। আমার মনে হয় ছাপায় কোন গোলমাল ঘটেছে।" স্বাঃ শান্তিদেব ঘোষ ১৭।১।৫৬

শান্তিদেববাবু স্বাক্ষর করা লেখা এখনো আমার কাছে রয়েছে। আমার মনে হয় বোর্ডের কাছেও আছে। শান্তিদেববাবুর যা মনে হয়েছে তা-ই তিনি ব্যক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে এই 'মনে হওয়া' ব্যাপারটি বেশ গোলমেলে। যিনি আমার ঐ গানটি অনুমোদন করতে চাননি তাঁর নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছিল—আবার শান্তিদেববাবুর অন্যরকম মনে হল। কার মনে কী 'মনে হয়' তা বলা খুব শক্ত—সুতরাং রেকর্ডের অনুমোদনের বিচারের ক্ষেত্রে কোনো uniformity আশা করা বৃথা। অবশ্যি একথা স্বীকার করতেই হয় যে একটা কিছু নিয়ম মানার প্রয়োজন—রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো নিয়মের কথা বলে যাননি সুতরাং ছাপানো স্বরলিপি বই-গুলিকেই এই ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হয়। যদিও তাতে অনেক সময় ভুল থাকে, তবুও তা দেখে সুরের structureএর একটা ধারণা করা যায়। স্বরলিপিতে যা স্বর অথবা সুর লেখা থাকে সেগুলি strictly মেনে চললেও গান বিভিন্ন ঢঙের হতে পারে—রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। তবে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে শ্রুতির খাতিরে স্বরলিপিতে যে মাত্রাভাগ দেওয়া থাকে তার সামান্য একটু অদলবদল করতেই হয়—তা না করলে গান শুকনো কাঠ হয়ে যেতে বাধ্য। আমি এ ধরনের অদলবদল দিনেন্দ্রনাথকেও করতে দেখেছি—ইন্দিরা দেবীকেও দেখেছি—স্বরলিপি প্রস্তুত করার সময় শুধুমাত্র সুরের broad outlineটা-ই দেওয়া সম্ভব—শ্রুতি এবং গায়নভঙ্গী স্বরলিপি করে বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নয়—রবীন্দ্রনাথ নিজেও গায়কের নিজের ঢঙের ব্যাপারে গায়ককে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না।

আমি শুনেছি এখন যাঁরা মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষক তাঁদের অনেকেই আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট। তাঁরা যদি ভাবেন যে বিশেষ কোনো গানের Interpreation এবং Expression-এর ব্যাপারে তাঁদের যা ধারণা সেটাই ঠিক এবং সেইভাবেই আমাকে ভাবিত হতে হবে—তাহলে আমার বলার কিছুই নেই। এই ব্যাপারে আপনার কিছু করা উচিত হবে কিনা তা আমি জানি না। Sentiment এবং Expressionএর ব্যাপারে তাঁরা যদি

আমায় কোনো স্বাধীনতা দিতে না চান তাহলে তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করার চাইতে চুপ করে থাকাটাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হয়।

আমার গানের রেকর্ডগুলির অনুমোদনের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনাকে লিখিনি। আমি শুধু নতুন কতগুলি অর্থহীন, যুক্তিহীন নিয়মের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—Music accompaniment, Interlude music, Various types of musical instrument, Tempo, Style and mode এবং তালের ঝোঁক ইত্যাদি ব্যাপারে নতুন সব বিধিনিষেধের বেড়াজাল রবীন্দ্রসংগীত এবং তরুণ গায়কগায়িকাদের কারুর পক্ষেই মঙ্গল-জনক হতেই পারে না। এই নিয়মগুলি যাতে ঐ সব গায়কগায়িকাদের কাঁধে না চাপানো হয় তার একটা ব্যবস্থা করার জন্য আপনার কাছে আমার একান্ত বিনীত নিবেদন। আশা করছি আপনার সহানুভূতি ও সহৃদয়তা···

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম জানাই

ইতি

জর্জ

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র,

২ বি অভয় গুহ রোড কলি

এই চিঠিতে আমি নিজেকে 'জর্জ' বলেই অভিহিত করলাম কারণ শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রবাবু আমায় জর্জ বলেই সম্বোধন করতেন।

এই চিঠির পর আমি তাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি এবং নিজেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। কেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি সে বিষয়ে আমি পরে অর্থাৎ তাঁর কাছে ৩০।৫।৭৭ তারিখে লেখা আমার একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছি।

১৯৭৪ সনের এপ্রিল মাসে ১৭ই তারিখে কলকাতার আনন্দ-বাজার পত্রিকায় আমার গান গাওয়ার ব্যাপারে একটি বিরূপ

সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল—লেখকের নাম দেওয়া হয়েছিল—'স ক ঘ'। তারপর থেকে ওই পত্রিকাতেই আমার পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা লোকের নানা মতামত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। এদিকে আবার কলকাতার যুগান্তর পত্রিকায় কিছু কিছু সমালোচক পঞ্চমুখে আমার গান গাওয়ার প্রশংসা করে নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর থেকে অনেক পত্রপত্রিকার সমালোচক এবং প্রকাশকরা আমার ঘরে এসে এই ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছে কিন্তু আমি তাঁদের কাছে এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্যই করিনি। আমার এক নাতনীর (অর্থাৎ ভাগ্নীর মেয়ে) সহপাঠিনী সন্ধ্যা সেন সাংবাদিকতার কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম, "আপনি তো খবরের কাগজের লোক—সরে পড়ুন সরে পড়ুন।"

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ থেকে যে সব শরণার্থী কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোলাম মুরশিদ নামে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক। তিনি প্রায়ই আমার ঘরে এসে আমার খোঁজখবর করতেন এবং আমার কিছু গানও টেপরেকর্ডার দিয়ে রেকর্ড করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পর তিনি বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সনের ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমার কাছে লেখা তাঁর একটি প্রতিলিপি নিচে দিলাম।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু রাজশাহী

জর্জদা, আনন্দবাজারে স-কু-ঘোর লেখা পড়ার পর লিখছি। আপনি নিশ্চয়ই এক সঙ্গীত-অজ্ঞ উৎসাহী ভদ্রলোকের লেখা পড়ে চটেছেন, স্বাভাবিক। কিন্তু মাফ করে দিন।

ভদ্রলোক আপনার প্রশংসাও কম করেননি। তাছাড়া, আনন্দবাজারে আপনার গান নিয়ে উত্তরসম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে, এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে আপনি যে আলোড়ন তুলতে চেয়েছিলেন, তা সফল হয়েছে। আমার মনে হয়, বিশ্বভারতীর সঙ্গীত পর্ষদ্ এবার আবার বাধ্য হবে বিষয়টা নিয়ে নতুন করে ভাবতে।

কিন্তু জর্জদা আপনার এক অতিভক্ত শ্রোতা হিসেবে আমি যেকথা আপনাকে আগেও বলেছি তাই আবার মনে করিয়ে দিই। জানি আপনার হয়তো পসন্দ হবে না; এবং আমার মতো পূর্ববঙ্গের মানুষ বলে আপনি হয়তো যুক্তিও মানবেন না; কিন্তু তবু একবার ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। সকুঘোর লেখা বেরোবার পরে এবং গতবার আমার লেখা বেরোবার পরে যে চিঠিগুলি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়, সেগুলি থেকে কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১. আপনি দারুণ জনপ্রিয়; ২. আপনার কণ্ঠের ভক্তসংখ্যা অগণ্য; ৩. আপনার কিছু কিছু উচ্চারণে কারো আপত্তি আছে; ৪ আপনার কোনো কোনো ভক্ত আপনার বর্তমান গানে বাজনার আধিক্য অপসন্দ করেছেন; অনেকেই কোনো সময়ে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পসন্দ করেননি। দোহাই জর্জদা, আপনি সেই ৯ জানুয়ারী লেখা ইস্কুল বালকের সরল চিঠিটি মনে করুন। "তুমি রবে নীরবে"র মতো গানের জন্যে সে প্রায় মারামারি করতে প্রস্তুত, কিন্তু সেও, আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না, কোন গানের যন্ত্রসঙ্গীতের আধিক্যে পীড়াবোধ করছিল। এখানে পয়লা বৈশাখ আপনার 'বৈশাখ হে মৌনী তাপস' শোনার জন্যে আপনার ঋতুসংগীতের রেকর্ডটি দিয়েছিলুম। গড়াতে গড়াতে গেলো 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' পর্যন্ত। মনে হল, কেন আপনি কলিগুলি দুবার করে না গেয়ে পানসে যন্ত্রসঙ্গীত দিয়ে ভরে দিলেন রেকর্ডটা। বিশ্বাস করুন, প্রত্যেকটা কলির ফাঁকে ফাঁকে এতোটা বিরক্তি যে, আমি খেই হারিয়ে ফেলছিলুম। অথচ একই গান আপনি টেপে গেয়েছেন; তুলনাহীন। মাসখানেক আগে আমাদের দেশের এক নামজাদা ইকনমিস্ট আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন ঢাকাতে। আমার কাছে আপনার গান আছে শুনে শুনতে এলেন। এখনো

এমন ভক্ত শ্রোতা আমি পাইনি আপনার টেপের। কয়েক ঘণ্টা তাঁরা চোখ বন্ধ করে দুজনেই শুনছেন ; সুর আর আপনার কণ্ঠছাড়া ঘরে একটি শব্দ নেই। তাঁদেরও রেকর্ডের প্রতি দেখলুম, আগ্রহ তেমন নেই। কিন্তু এসব কথা বলা বৃথা, কারণ আপনি তো শুনবেন না, শুনলেও বুঝবেন না, কারণ বুঝতে চাইবেন না। যাঁর কণ্ঠ যে কোনো বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে মধুর, তিনি যে কেন শ্রোতাদের যন্ত্রের ভেজাল দিয়ে শোনাবেন তাঁর কণ্ঠ, আমি জানিনে।

কদিন আগে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে একখানা বই পাঠিয়েছিলুম, রেজেস্ট্রি ডাকে ; পেয়েছেন ? পেয়ে থাকলে পড়েছেন ? এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনার মতামত জানাবেন।

আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, গান করছেন কখনো রবীন্দ্রসদনে কখনো অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন্ আর্টসে। অথচ আমি অনেক দূরে আপনার গান শুনতে পাচ্ছিনে, একে যে কতো বড় বঞ্চনা মনে হচ্চে জীবনের তা বোঝাতে পারব না।—

আমার কলকাতার প্রতি আর কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু যে কলকাতায় আপনি আছেন, বার বার সেখানে—আপনার অজস্র অপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি ছড়ানো ঘরে, ফিরে যেতে চাই। বার বার ভুলে যাই যাওয়ার অনেক বাধা।

শরীরের যত্ন নেবেন। আমরা আরো বহু বহু বছর আপনাকে আমাদের মাঝে পেতে চাই, আপনার গান শুনতে চাই।

আমরা একপ্রকার। এখনো বেঁচে আছি

প্রণামান্তে

ইতি

২৭ এপ্রিল ৭৪

স্নেহধন্য

মুরশিদ

পুনঃ—তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ বেরিয়েছে ? কারার ঐ লৌহ কপাট ?

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ ১৯৭১ সনে কলকাতায় এসেছিলেন এবং প্রায় এক বৎসর কলকাতায় ছিলেন। সেই সময় তিনি জানতেন যে রবীন্দ্রসংগীত আমি রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কবি বিষ্ণু দে মহাশয়ের একটি কবিতা 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'—এই কবিতায় আমি সুরারোপ করেছিলাম রেকর্ড করব বলে এবং কাজী নজরুল ইসলামএর কয়েকটি গান রেকর্ড করব বলে ঠিক করেছিলাম। মুরশিদসাহেবকে বলেও ছিলাম যে রেকর্ড করব কিন্তু করা হয়নি। মুরশিদসাহেবের উপরে উল্লিখিত চিঠিখানার যে উত্তর আমি পাঠিয়েছিলাম তার প্রতিলিপি :

৪ই বাসবিহারী অ্যাঃ কলকাতা-২৯
১৭।৫।৭৪

প্রীতিভাজনেষু অধ্যাপক মুরশিদসাহেব—

"ধর্মনিরপেক্ষতা" পাবার পর আপনার চিঠিও পেলাম—আশাকরি ৫ই মে তারিখে ডাকে দেওয়া তারিখহীন আমার চিঠিখানা এতো দিনে আপনার হাতে পৌঁছেছে।

সংবাদ লেখা পড়ে আমি কিছুই চটিনি— কারণ যখন থেকে কলকাতার গানের আসরে গান গাইতে শুরু করেছি তখন থেকেই কলকাতার খবরের কাগজের কলা সমালোচকরা আমার গান গাওয়ার নানা ধরনের বিরূপ সমালোচনা করে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। তখনকার দিনে আমার বামাসক্তি অর্থাৎ বামপন্থার প্রতি আসক্তি ওদের একেবারেই সহ্য হত না। প্রায় বিশ বছর আগে নানা কারণে ওই পথের নিশানা হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু দক্ষিণ দিকের পথ আমার মনটাকে টানতে পারেনি। তাই পথহারা পথিক হয়ে নিরুদ্দেশের পথিকের ডাকের অপেক্ষায় দিন কাটাই। তবে খবরের কাগজ মাথায় করে ঝড়বৃষ্টি ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করিনি বলে হয়তো কাগজওয়ালাদের দাক্ষিণ্য থেকে আমি এখনও বঞ্চিত।

সুতরাং নানা ধরনের বিরূপ সমালোচনা অথবা উপেক্ষা আমার গাসওয়া হয়ে গিয়েছে।

সকখর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। যেহেতু সাহিত্যচর্চা আমার কাছে অনধিকার চর্চা মনে হত সেই হেতু তাঁর নামও আমি শুনিনি। বছর দুয়েক আগে মায়াদিদের বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন তাঁর মুখেই শুনেছিলাম—তাঁর যৌবনকালে আমার গান শুনে নাকি তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন—আমার গান শুনলে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে—ইত্যাদি। তাঁর নিজের রবীন্দ্রানুরাগ আমায় দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা মুখস্থ শোনালেন। সাহিত্যের কী যেন একটা পুরস্কার—সকখ পেয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ব্যাপারে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ত্রিদিববাবুর বিরামহীন অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অনুষ্ঠানে আমায় যেতে হয়েছিল। আপনিও সেই অনুষ্ঠানে আমার পাশেই বসেছিলেন এবং যতদূর মনে পড়ে আপনারও এই ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না—হয়তো শুধু ছিল আপনার রবীন্দ্রসংগীত পিপাসা। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সবার শেষে আমায় যখন মঞ্চে তোলা হল, ওখান থেকে সকখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী গান শুনতে ওঁর ইচ্ছে করছে। উনি বোধ হয় এধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—তাই প্রথমে বেশ একটু থতমত খেয়ে গেলেন—পরে নিজেকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। এই ঘটনার পরেও তিনি বেশ কয়েকবার এবং একবার মস্কোনিবাসী ননী ভৌমিক এবং তাঁর রাশিয়ান স্ত্রীকে নিয়েও আমার ঘরে এসে ফরমাশ করে গান শুনে গিয়েছিলেন। দুবছর পর হঠাৎ আমার প্রতি তাঁর মনোভাবের এই পরিবর্তন ঘটবার পেছনে কারণ আছে নিশ্চয়ই। আমার গান গাওয়া ব্যাপারে তিনি যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন সেই জ্ঞান তাঁর নিজের অর্জিত জ্ঞান নয়। অনেকগুলি ইনজেকশন্ নেবার ফলে তাঁর এই জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে—যে ডাক্তারের চিকিৎসার অধীনে তিনি আছেন তাঁদের খবর আমি ভাল করেই জানি। সুতরাং আপনি

নিশ্চিত থাকুন—আমি মোটেই চটিনি, তবে প্রথম পড়ে আমার খুব হাসি পেয়েছিল।

আনন্দবাজার পড়ে আপনি যে পাঁচটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন সে সম্বন্ধে আমার বলার কিছুই নেই। তবে যতই বিনয় করিনা কেন—এটুকু না বলে থাকতে পারলাম না, ঐ তথ্যগুলি যা আপনি এখন আবিষ্কার করলেন সেগুলি কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। (সকথর যৌবন কালও তার সাক্ষী।) তাই আমার কাছে ওগুলি নতুন নয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে গত বৎসর আমার একটি চিঠিতে আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম যে আপনি এবং আপনার মতো কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীতের আকাশে নভচারী শ্রোতা নিতান্তই সংখ্যালঘুর দলে। আপনার এবারকার চিঠিতেও আপনি বাংলাদেশের এক নামজাদা ইকনমিস্ট ও তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে লিখেছেন—"এখনো এমন ভক্তশ্রোতা আমি পাইনি আপনার টেপের" —সুতরাং আপনি নিজেই বুঝে দেখুন আপনারা কেন সংখ্যালঘু। আমি আরো জানিয়েছিলাম যে আমার কারবার সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে—যারা রবীন্দ্রনাথের ধারও ধারে না—অথচ আমার অজানা কোনো কারণে অসম্ভব রবীন্দ্রসংগীতবিলাসী। তাদের মন ভোলাবার আশায় অর্থাৎ সোজা কথায় তাদের Emotion এবং Intellectকে গভীরভাবে নাড়া দেবার চেষ্টায় আমি রবিঠাকুরের গানগুলির গায়ে নানান রঙচঙ লাগিয়ে পরিবেশন করি। রেকর্ডে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আপনার কাছে ভেজাল মনে হতে পারে—কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে ঐ ভেজাল দেওয়া জিনিসই ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল ভীষণ বেশী পছন্দ করে। তাদের নিয়েই তো আমি আছি।

আপনি আমার চাইতে অনেক বেশী জ্ঞানী এবং পণ্ডিতও। জ্ঞান বিতরণ করা আপনার পেশা। সুতরাং আপনার যুক্তি খণ্ডন করার মত পাণ্ডিত্যও আমার নেই। তাছাড়া যুক্তিতর্কের ব্যাপারেও আমি নেই। মানুষের সেবা করে যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের কাজের সমর্থনে যুক্তি আছে। আবার যাঁরা মানুষ খুন করে আনন্দ পান তাঁদেরও যুক্তির অভাব হয় না। এই দুই জাতের

মানুষের মধ্যে কারা মন্দ তার বিচার নিয়ে মতভেদ থাকবেই। তাই যুক্তিতর্কের মধ্যে আমি নেই—কীই বা বুঝি? বিশ্বযাত্রার তালে তাল মিলিয়ে, আমি যে নদী বেয়ে চলেছি সে নদীটাও চলছে। যদি আমার নৌকোটা সেখানে না চলে তাহলে নৌকো হাজার দামী হলেও তাকে ছেড়ে কলাগাছের ভেলায় চড়ে ভেসে ভেসে এগিয়ে যেতে থাকব কারণ এই এগিয়ে যাওয়াতেই তো আমার আনন্দ।

আপনি সাহিত্যিক—বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আপনি সাধনা করে চলেছেন। আপনার সাহিত্যের ক্লাসে যদি সেই আদ্যিকালের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল জাতীয় সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই পড়ানো না হত তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি আপনার ক্লাসে একটিও ছাত্র অথবা ছাত্রী ভর্তি হত না। আপনাদের মানবিকতার রবীন্দ্রনাথ যিনি সাহিত্যের কারবারী হিসাবে আপনাদের চাইতে কিছু কম ছিলেন না—তিনিই সবাইকে শিখিয়েছিলেন—বিদেশের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লেগেই নাকি বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। "তদানীন্তন কালে নাকি বলা হত—এ সমস্তই ভুয়ো; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল।" এই ব্যাপারে রবিঠাকুর লিখেছেন—"তাদের কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে একথা বলতে হবে—নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে চলে যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।" এতো সব লিখে ফেললাম—হয়তো বেয়াদবী হল—তাই মাফ চাইছি। রবিঠাকুরের এই কথাগুলির যৌক্তিকতা বিচারের ব্যাপারে আমি নেই—আপনারা যদি ইচ্ছে করেন করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এবং রবিঠাকুর নিজেও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের মধ্যে বিদেশী ভেজাল মিশিয়েছিলেন বলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপনারা মনের আনন্দে ব্যবহার করে, গৌরব করে বলেছেন—"মোদের গরব মোদের আশা —আ মরি বাংলা ভাষা।" সাবেক কালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রিসার্চ-করুয়া-পড়ুয়াদের কাজে লাগাতে পারে কিন্তু বর্তমান কালের সাধারণ পড়ুয়ারা

ঐ সব জিনিসে আর আনন্দ পায় না। আগেকার দিনের ভাষা ও সাহিত্য কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারা ও রূপ পালটে ফেলেছে—হয়তো ভবিষ্যতে আরও ফেলবে। বিজ্ঞানও এগিয়ে চলেছে। আমার ছাত্রজীবনে আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার গান আমার ঘরে বসে ফিতের তুলে নিয়ে রাজশাহী এবং ঢাকার ইন্‌টেলেকচুয়্যালরা গভীর আনন্দে মশগুল হয়ে থাকবেন। আমাদের প্রত্যেকটি ললিতকলার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সমান তালে চলেছে—বিদেশী ভেজাল এসে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করছে বলেই তা সম্ভব হচ্ছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও যে ভঙ্গীতে ও ধারায় রবীন্দ্রসংগীত এবং অন্যান্য গান গাওয়া এবং রেকর্ড করা হত সেই সব ভঙ্গী ও ধারা অনেক পালটে গেছে। রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে মানুষ প্রতিনিয়তই এগিয়ে চলেছে। বিদেশে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে—ভারতেও হচ্ছে। বিদেশের কিছু কিছু নতুন যন্ত্র এদেশে এবং বাংলাদেশেও রেকর্ডে ও সিনেমাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো হবে। রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রের এই অগ্রগতিকে ভেজাল বলে তুচ্ছ করার মধ্যে হয়তো আপনার যুক্তির অভাব হবে না—হয়তো বলবেন এতে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বিঃ ভাঃ মিউজিক বোর্ডের মাঝারি কর্তাদের ঐ একই অভিমত। আগের চিঠিতে আমি যে অদৃশ্যলোক অবস্থিত একটি ভৌতিক শক্তির কলকাঠির নড়নচড়নের কথা লিখেছিলাম সেই শক্তির কলকাঠির নড়নচড়নের ফলে আমার মন বলে—"নব নব যুগের নব নব সৃষ্টির স্বপ্রকাশের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, আমাদের মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে সযত্নে ঘিরে রেখে তাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না;" ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতারাই তাকে বর্জন করবে কারণ তাদের কানও বদলে গিয়েছে। আর যুক্তিবাদী সংখ্যালঘু শ্রোতাদের সেলাম জানিয়ে বলি—পঞ্চাশ বছরের পুরানো আচারের শেকল দিয়ে আমার গান গাওয়াকে বাঁধতে পারব না। আমি জানি—বাদ্যযন্ত্রের ভেজাল ছাড়াও আমার কণ্ঠের আওয়াজের নানা ধরনের প্যাটার্নের সাহায্যে ঐ অগণিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা সারাজীবন পেয়ে

আমি ধন্য হয়েছি, সেই কণ্ঠের আওয়াজের মধ্যেও বিদেশের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লেগেছিল—যদিও বাঁধা মতের পণ্ডিতরা ঐ ব্যাপারটিকে "অতি নাটকীয়তা" বলে গাল পাড়েন। নতুনের পথে খুঁড়িয়ে চলব তাও আচ্ছা—ভূতকালের ভূতে-পাওয়া মানুষ হতে আমি কিছুতেই রাজী নই।

আশাকরি আপনি, বেগমেলিজা ও সন্তানসহ ভালই আছেন—

আদাবান্তে

জর্জদা।

পুঃ—আর কোনো গান রেকর্ড করিনি।

গোলাম মুরশিদসাহেবকে লেখা এই চিঠিখানাতে এমন অনেক কথা আছে যা আমি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনারারী সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে দুটো চিঠিতে ১৯৭৪ সনের ফেব্রুআরি মাসে লিখেছিলাম। তাছাড়া মুরশিদসাহেবকে লেখা এই চিঠিতেও আমি অনেক বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেছি যা রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তাপ্রসূত লেখাগুলি থেকেই ধার করা। ১৯৭৪ সনের পয়লা নভেম্বর তারিখে গোলাম মুরশিদ আমায় আবার একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই ব্যাপারটি পরে যথাস্থানে উল্লেখ করব।

'একটি অসাক্ষাৎকার'

১৯৭৪ সনের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে একটি তরুণ যুবক আমার ঘরে হানা দিলেন। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, কথাবার্তায় যথেষ্ট মার্জিত। পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানলাম তাঁর নাম জ্যোতির্ময় দত্ত—সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু মহাশয় তাঁর শ্বশুর। তারপর তিনি বললেন যে তাঁরা কয়েকজন মিলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—পত্রিকাটির নাম 'কলকাতা'। আমার একটি সাক্ষাৎকার তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। আমি তখন হাতজোড় করে বললাম, "জ্যোতির্ময়বাবু, এব্যাপারে আমাকে আপনার ক্ষমা করতেই হবে। কারণ আমি জানি আমি কিছু কেউকেটা ব্যক্তি নই।" জ্যোতির্ময়বাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন কিন্তু দুয়েক দিন পরে হঠাৎ সকালে এসে আমার ঘরে একটি টেপ করার যন্ত্র এবং একটি প্রশ্নপত্রের মতো কাগজ রেখে, আমায় কথা বলার সুযোগ না দিয়েই কেটে পড়লেন। কাগজটি নেড়েচেড়ে দেখলাম। তারপর ভাবলাম ওরা হয়তো আমার কথাগুলি নিয়ে ঘরে রেখে দেবেন কিংবা বন্ধুবান্ধবদের শোনাবেন। তাই কিছু বকবকানি রেকর্ড করে রেখে দিলাম। আমার সেই কথাগুলি এমনি কথা বলার ঢঙেই বলে ছিলাম। কোন পত্রিকায় ছাপিয়ে প্রকাশ করার মতো খুব একটা serious moodএ বলিনি। বরং বেশ একটু মজা করার মতো বকবকানিই তাক্তেছিল।

পরে একদিন জ্যোতির্ময়বাবু আর তাঁর এক বন্ধু এসে টেপ করার যন্ত্রটি নিয়ে গেলেন এবং সেই সঙ্গী বন্ধুটিকে দিয়ে আমার কয়েকটি ফটো তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

কয়েক দিন পরে জ্যোতির্ময়বাবু হঠাৎ ঝড়ের মতো আমার ঘরে 'কলকাতা' পত্রিকার জুন-জুলাই ১৯৭৪-এর সংখ্যাটি দিয়েই চলে গেলেন। আমি পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখতে পেলাম আমার কয়েকটি ছবি এবং তার পাশেই একটি বড় হরফে ছাপানো-- 'একটি অসাক্ষাৎকার' নাম দিয়ে কতগুলি লেখা ছাপানো। ব্যাপারটি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। দেখলাম আমি ওদের টেপ রেকর্ডে যে কথাগুলি কোনো ভাবনাচিন্তা না করে বলেছিলাম ঠিক সেই কথা-গুলিই জ্যোতির্ময়বাবু ওঁদের পত্রিকায় ছাপিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে রাজী হয়নি বলেই জ্যোতির্ময় দত্তমশাই টেপ রেকর্ডারের সাহায্য নিয়ে আমায় রীতিমত ঠকিয়ে দিয়ে অবাক করে দিলেন। জ্যোতির্ময়বাবুর টেপে যা বলেছিলাম তা হল :

আজ সকাল অর্থাৎ ১৯৭৪ সনের ৮ই জুলাই, আপনার টেপ করার যন্ত্রটি আর কয়েকটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছেন। আপনার প্রশ্নপত্রটি আমি পড়ে দেখলাম। দেখলাম অনেকগুলি একেবারে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে আমি অত্যন্ত সংকোচ বোধ করি। আপনার আগে অনেক সাংবাদিক এসেছিলেন আমার কাছে, অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কাউকেই আমি কিছু বলতে পারিনি। অনেকে আবার আমায় সংবর্ধনার লোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের কাউকে কাউকে আমি বলেছি যে আমার অবস্থা যেদিন কাজী নজরুলের মতো হয়ে যাবে সেদিন আমায় যতো খুশি সংবর্ধনা জানাবেন, আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু যদ্দিন না হই তদ্দিন এই

সব সংবর্ধনা-টংবর্ধনার মধ্যে আমি থাকতে পারব না। আবার কাউকে বলেছি, আমার গুরুর মানা আছে। তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি বিচার করে বলুন, আমি এতোদিন আমার নিজের সম্বন্ধে যাঁদেরকে কিছুতেই বলতে পারিনি বা বলিনি, তাঁদের কানে যদি কোনো মতে খবরটা পৌঁছে যায় যে আপনাদেরকে আমি এই ব্যাপারে কিছু টেপ করে দিয়েছি, তাহলে তাঁরা আমায় কী চোখে দেখবেন, বলেন? তাঁরা কি আমার গায়ে থুথু দেবেন না! আর সেটা কি আমার পক্ষে খুব গৌরবের ব্যাপার হবে? আপনিই বলেন? তবে আপনার প্রশ্নপত্রটিতে কয়েকটি প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমি দিতে পারব। সবগুলি পারব না। যেগুলি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেগুলি কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। প্রশ্নগুলি আমি পড়ে যাচ্ছি।

আপনি কতদিন রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন? আপনার শৈশবের-সংগীতগুরু কারা? সংগীত, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ—

এই প্রশ্নের উত্তরে আমার কিছুই বলার নেই, কারণ এটা খুব ব্যক্তিগত। কতোদিন রবীন্দ্রসংগীত গাইছি তা আমি নিজেও জানি না। শৈশবের সংগীত গুরুটুরু আমার কোনো কালেই ছিল না! ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ—আমার ঠাকুর্দা ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং বংশপরম্পরায় আমিও ব্রাহ্ম। ওই—নামে ব্রাহ্ম আর কি। তবে ব্রহ্ম-ট্রহ্মর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

রবীন্দ্রনাথ কি আপনার গান শুনেছিলেন? রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ও বর্তমান শিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক?

রবীন্দ্রনাথ আমার গান শুনেছিলেন। আর রবীন্দ্রসংগীতের আগেকার দিনের এবং বর্তমান গায়কগায়িকাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। মানে আমি তাঁদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। তাঁরা আমাকে কী চোখে দেখেন সেটা আমি বলতে পারব না।

রবীন্দ্রসংগীত বোর্ড কেন? কারা এটা চালান? কী ভাবে? এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

রবীন্দ্রসংগীত বোর্ড কেন, তার ইতিহাস আমার জানা নেই। কারা এটা চালান তা আমি জানি না। কী ভাবে চালান, তাও আমি জানি না। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বুঝলেন?

আপনার বামাচার! লোকসংগীতের দ্বারা তখন কি আকৃষ্ট হয়েছিলেন? IPTA-র সঙ্গে যোগ। সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব। আপনি এখন দক্ষিণপন্থী?

আমার বামাচার কিছুটা ছিল। বামপন্থার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। তবে লোকসংগীত আমাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। আর IPTA-এর নব নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগ খানিকটা ছিল এটা ঠিকই। অভিজ্ঞতা কী হয়েছে তা আমি কিছুই জানি না। আর আমি এখন কোনো পন্থীই নই, একমাত্র ভিক্ষাপন্থী, অর্থাৎ ভিক্ষা করে পেট চালাই। এবং খালি পেট না, আমার ওষুধপত্র কেনার জন্যও টাকার হয়। তার জন্যে আমায় গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়। যদি কেউ ভিক্ষা না দেয় সরে পড়ি।

আপনার গানে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে? অতিনাটকীয়তা?

আমার গানে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না এসেছে, সেটা শ্রোতারা বলতে পারেন। আর অতিনাটকীয়তা সম্পর্কে যাঁরা নাকি সমালোচক তাঁরাই বলতে পারেন। আমি কী করে বলব এসব ব্যাপার? অবশ্য অনেকে বলেন যে আমার নাকি নাটকীয়তা দোষে গানটা দুষ্ট। ইত্যাদি বলেন-টলেন—তা আমি ওগুলো কানে নিই না কিছু।

পাশ্চাত্যপ্রভাব আপনি কেন পরিহার করছেন না? কেন এতো বিদেশী বাজনা?

এখন এ ব্যাপারে আমি কী বলব? পাশ্চাত্য প্রভাব তো সব জায়গাতেই আছে। আপনি যে বাংলা ভাষা লিখছেন সেও বিদেশের প্রভাব এসে পড়েছে বলেই বাংলা এমন সমৃদ্ধ হয়েছে। আর, কোনো সভ্যতাই একলা নিজেকে সৃষ্টি করতে পারেনি। সব সময় এরকম মিক্স্‌চার হয়েছে। আপনাদের ইংরেজী ভাষাও তো নানা বিদেশী প্রভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। আর কেন এতো বিদেশী বাজনা? বিদেশী বা দিশি বাজনা হলে যে কী হয় আমি জানি না। সেতার? সেতার বাজনা বিদেশী না দেশী তা কি আপনি বলতে পারেন? আমি তো শুনেছি সেতার পারস্য থেকে এসেছে। এখন কোনটা কোন দেশের আমি কী করে জানব? আর পাশ্চাত্য প্রভাব পরিহার করব কেন? পাশ্চাত্য প্রভাব তো সব জায়গাতেই। আপনি যেমন পেণ্টুলন পরছেন, শার্ট পরছেন। আগেকার দিনে যে ভারতীয় পোশাক ছিল আপনি সেটা বর্জন করেছেন। কেন করেছেন আপনি কি সেটা বলতে পারেন? ও কিছু বলা যায় না।

আপনার নতুন গান যদি বোর্ড পাস না করেন, আপনি কী করবেন?

আমি আর কী করব! আমি তো সেই ১৯৭১ সালে শেষ রেকর্ড করে দিয়েছি। রবীন্দ্রসংগীত। আর তারপর আর কোনো গান রেকর্ড করিনি। সুতরাং বোর্ড পাস করলেই বা কি, আর না করলেই বা কি। আমি তো আর রেকর্ড করছি না। এখন আধুনিক কবিরা যে গান লেখেন— যাদবপুরের একটি ছেলে অনাথবন্ধু দাস সুর করেছেন, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, সেইটাই রেকর্ড করব বলে ভাবছি। তা রেকর্ড কোম্পানী যদি সেটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তাহলে রেকর্ড করবেন—না করলে আর কী করব? মঞ্চে মঞ্চে ভিক্ষে করেই বেড়াব।

এইখানেই আমার 'অসাক্ষাৎকার' শেষ। তারপর 'কলকাতা' পত্রিকার সংখ্যাতেই 'মানুষ দেবব্রত' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ

করা হয়েছে। তাতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু পড়ে দেখলাম আমার যৌবনকালের অনেক টুকিটাকি তথ্য কিশোরগঞ্জের সেই ইন্দুভূষণ রায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইন্দুভূষণ তখন দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার একজন পদস্থ কর্মচারী। হঠাৎ ইন্দু আমায় একদিন দেখতে এসেছিল। সে প্রায়ই আমার দেখাশোনা করে যায়। সেদিন সে আমার ঘরে ঢুকতেই তাকে আমি বেশ ভর্ৎসনার সুরেই বললাম, 'গুপাল—কইলকাত্তা পত্রিকায় আমার পুরান গপ্পো তুই কার কাছে কইছস? এইটা কি তোর ঠিক্ হইল?' ইন্দু তখন বলল যে জ্যোতির্ময় দত্তই তাকে ভীষণভাবে অনুরোধ করেছিল। ওর সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে বলেই ওকে এড়িয়ে যাওয়া ইন্দুর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ইন্দুর একমাত্র কন্যা স্বাতীর সঙ্গে বুদ্ধদেববাবুর একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল বসুর বিয়ে হয়েছে। সেই সূত্রেই জ্যোতির্ময় ইন্দুকে পাকড়াও করেছিল এবং তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়।

১৯৭১ সন থেকে আমি কোনো রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করছি না। কিন্তু অনেকেই ভেবেছেন যে মিউজিক বোর্ড আমার রেকর্ড করা বন্ধ করেছেন। এই ব্যাপারে চেনা এবং অচেনা বহুলোকের কাছ থেকে আমি নানা ধরনের চিঠি পেয়েছি এবং সবাইকে চিঠিতে জানিয়েছি যে মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকরা আমার রেকর্ডের কয়েকটি গান অনুমোদন করতে চাননি কারণ তাঁদের মতানুসারে আমার সেই গানগুলি অনুমোদনযোগ্য নয়। তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মত মেলে না তাই আমি নিজেই রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে একটিমাত্র রবীন্দ্রসংগীত গায়ক যাঁর কথা আমি অনেকবার উল্লেখ করেছি—হেমন্ত মুখার্জি, একবার একটি গানের আসরে এবং আরেকবার আমার ঘরে এসেও বলেছিলেন—"জর্জকাকা, আমি মার্কস পড়িনি, পলিটিকস বুঝি না—কিন্তু যখন হাজার হাজার লোক আপনার গান শুনতে উন্মুখ তখন আপনি কেন রেকর্ড করা বন্ধ করলেন? তখন আমি তাঁকে বুঝিয়েছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে মিউজিক সম্বন্ধে কোনো নিয়ম অথবা বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করে যাননি সেখানে ওই মাঝারি কর্তাদের নির্দেশ মেনে আর রেকর্ড করার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। তাছাড়া ওই মাঝারি কর্তাদের ধরাধরি করে রেকর্ড অনুমোদন করিয়ে নেবার মতো মানসিকতাও আমার নেই।

ইতিমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক: জনাব গোলাম মুরশিদ ১৯৭৪ সনের পয়লা নভেম্বর তারিখে, আবার আমায় একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। তাঁর চিঠির সঙ্গে, আরেকটি বাংলায় টাইপ করা চার পৃষ্ঠার একটি বিরাট চিঠির প্রতিলিপিও আমায় পাঠালেন। সেই চিঠিখানা তিনি কলকাতার কোনো এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপিয়ে প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমি জানি না। মুরশিদসাহেব হাতে লিখে আমায় যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করলাম:

চিঠিপত্র : প্রথম কিস্তি

রাজশাহী

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

জর্জদা, কতোকাল আপনার গান শুনিনি রেডিওতে তার ঠিক নেই। বোধহয় মাস দুয়েক আগে একদিন ছিল প্রোগ্রাম—এক বন্ধুর কাছে শুনলাম। আপনার কবে প্রোগ্রাম থাকে যদি একটি পোস্টকার্ড করে জানাতেন। নজরুলের একটা গান আছে···তাতে তিনি বলেছেন—আমায় নহে গো ভালোবাসো মোর গান। এটা আসলে কবির অন্তত নজরুলের মনের কথা হতেই পারে না। আমরা আপনার গানকে ভালবাসি সেই সঙ্গে আপনাকে সেজন্যেই যখন অমৃতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পর্যালোচনা পড়লুম খুব ভালো লাগল। এই সঙ্গে টাইপ করা চিঠিখানা পাঠালুম···প্রকাশের জন্যে। কলকেতে লোক তো, ছাপাবে কিনা জানিনে। ছাপালে আমার মনে হয়, নতুন করে একেবার বিতর্কের সূচনা করা যেত। কিন্তু মিউজিক বোর্ডের টনক নড়ল কি নাই নড়ল, আপনি কেন নীরব হয়ে থাকবেন? নজরুলের যে গান কটি আপনি রেকর্ড করবেন বলেছিলেন, কেন করছেন না? বিষ্ণু দের গান দুটিও খুব ভালো হত। আপনি নিজে রাগ করবেন মিউজিক বোর্ডের মতো একটা সংস্থার সঙ্গে এবং বঞ্চিত করবেন আপনার অগণ্য ভক্তদের, এটা ঠিক নয়। কবে আপনি মুখ খুলবেন তার জন্যে আমরা বসে আছি।

আপনার স্বাস্থ্য কেমন কাছে জানাবেন। আমরা একপ্রকার।

প্রণামান্তে   স্নেহধন্য

ইতি ১ নভেম্বর ৭৪   মুরশিদ

এই চিঠির জবাবে আমি গোলাম মুরশিদকে যা লিখেছিলাম, তা নিচে দিলাম।

কলকাতা
৫।১১।৭৪

পরমপ্রীতিভাজনেষু অধ্যাপক মুরশিদসাহেব—

অনেকদিন পর আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। সঙ্গে গাঁথা··· আপনার টাইপ করা চিঠির নকলও পেলাম।

গত জুলাই মাস থেকে অনবরত নানা ধরনের অসুখে ভুগে যাচ্ছি—নিদারুণ বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম—এখন একটু একটু হাঁটতে শিখেছি। হাতের আঙুলগুলিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল—এখন আবার হাতের লেখার অভ্যাস ফিরে পেয়েছি। তবে গলা লাগাতক ধর্মঘট করেই আছে।

আপনার টাইপ করা চিঠিখানা পড়ে দেখলাম—কথাবার্তা বেশ জোরালো হয়েছে—তবে চিঠিখানা সত্যি খুব সুন্দর হত যদি দেবব্রত বিশ্বাসের নামোল্লেখ না থাকত। লিখেছেন—আপনার চিঠিখানা ছাপালে, আপনার মনে হয়েছে যে নতুন করে একবার বিতর্কের সূচনা করা যেত। এব্যাপারে আমার বক্তব্য পরে বলব। আপনি আরো লিখেছেন "আপনি নিজে রাগ করবেন মিউজিক বোর্ডের মতো একটা সংস্থার সঙ্গে এবং বঞ্চিত করবেন আপনার অগণ্য ভক্তদের, এটা ঠিক নয়। কবে আপনি মুখ খুলবেন তার জন্যে আমরা বসে আছি।" আরেক জায়গায় লিখেছেন—"কিন্তু মিউজিক বোর্ডের টনক নড়ল কি নাই নড়ল আপনি কেন নীরব হয়ে থাকবেন?"

মুরশিদসাহেব—আপনি বিশ্বাস করুন—মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে আমার কোনো রাগারাগির ব্যাপার নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বোর্ড রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডগুলি অনুমোদন করেন অথবা করেন না—এবং বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া কোনো রেকর্ড প্রকাশিত হতে পারে না। এই অনুমোদনের ব্যাপারটির জন্য বোর্ড নির্ভর করেন কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ

গায়কগায়িকা—যাঁরা বোর্ডের সঙ্গে পরীক্ষকরূপে সংশ্লিষ্ট আছেন—তাঁদের মতামতের ওপর। ঐ সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়কগায়িকারা বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছে—তাঁদের গান অনেকেই ভালোবাসেন—আমিও। সুতরাং রাগারাগির কোনো ব্যাপারই নেই। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপারে বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও বোর্ড তাঁদের সুপারিশের ওপর নির্ভর করে বিধিনিষেধ জারী করেন। ঐ পরীক্ষকদের মতামতের সঙ্গে আমার মত মেলে না—ওরা আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট—তাই ওদের ওপর রাগও আমি করতে পারি না—তাই চুপ করেই থাকতে হয়—তাছাড়া আর উপায় কী ?

যেসব কারণে আমার রেকর্ডগুলি নাকচ হয়ে যায় তাতো আপনার জানা আছে—যথা : (১) Music accompaniment to much (২) Music hampers the sentiment of the song (৩) Tempo is too quick এবং (৪) "অসুন্দরের পরম বেদনায়" গানটি কথা বলার ঢঙে গাহিতে হইবে, কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাস গানটি কথা বলার ঢঙে গাহিতে পারেন নি। সুতরাং গানটি অনুমোদিত হল না।" এই ধরনের বেশ মজার মজার যুক্তি দিয়ে আমার রেকর্ড বাতিল হয়ে যায়। ওদের ১নং এবং ২নং যুক্তির সঙ্গে কিছুকাল আগে আপনিও একমত ছিলেন। আপনার টাইপ করা চিঠিতে দেখলাম এবার আপনি একটু উদারতা দেখিয়েছেন। আপনি তো নিজেও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে আমার গানের যে দোষ সেই সব দোষ আমি ছাড়া অনেক গায়কগায়িকাদের গানের রেকর্ডেও থাকে কিন্তু ওদের রেকর্ড পাসপোর্ট ভিসা অনায়াসে পেয়ে যায়। আমার কিছু শুভানুধ্যায়ী বন্ধু প্রায়ই বলেন কিছু কিছু আবেগপ্রবণ শ্রোতারাই (আপনাদের মতো) আসলে এই ব্যাপারে দায়ী এবং দোষীও। আপনারা আমায় অকারণে এবং অযথা মাথায় তোলেন বলেই মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকদের গায়ে নাকি জ্বালা ধরে যায়। এসব আগে বিশ্বাস করতাম না—এখন করি—আপনার টাইপ করা চিঠি এবং অন্যান্য শ্রোতাদের চিঠিই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। কী দরকার ছিল

আপনার এইসব আবোল-তাবোল কথা লিখবার? এতে কি টনক কারোর নড়ে? আমার ব্যাপারে কেউ ঢাক পিটিয়ে কিছু জাহির করলে আমার সমস্ত অন্তর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং আমিও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। আমাদের রেকর্ড কোম্পানী একবার কাগজে আমার রেকর্ড সমালোচনা করতে দিয়েছিলেন বলে ওদের কাজে ইস্তফা দিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম—পরে ওরা দুঃখ প্রকাশ করায় ইস্তফা দিতে হয়নি। আপনার সঙ্গে তো কাজে ইস্তফা দেবার সম্পর্ক নেই—কিন্তু আপনার চিঠি যদি এরা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয় তাহলে আমি পরম তৃপ্তিলাভ করব।

লিখেছেন মুখ খুলতে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করে মুখখোলা সম্ভব নয়, কারণ রেকর্ড বাতিল হলে কোম্পানীর অর্থ লোকসান হয়—আমি তাতে ভীষণ লজ্জিত হই। নজরুল এবং বিষ্ণুবাবুর দুটো চারটে গান রেকর্ড করে দিতে পারি—কিন্তু তারপর আবার সেই মুখ বন্ধ।

আরেকটি মুখ খোলার পথ হল আপনার পথ—অর্থাৎ আপনি যেমন ওপারে বসে আঁকশি দিয়ে খোঁচা মেরে মুখ খোলার ব্যাপারটি দেখাচ্ছেন—ঐ ধরনের মুখখোলা আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আমার মানসিকতাই প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার আছে—ছোট করে বলি। আমি শুনেছি আগেকার দিনে রাজতন্ত্রে, সামন্ত—জার—ডিকটেটারতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জীবন নাকি অত্যাচার ও অবিচারে বিপর্যস্ত হত। বর্তমান কালের নানা ধরনের তন্ত্রে অত্যাচার ও অবিচারের অবসান ঘটেছে বলে খবর এখনও পাইনি। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করার লোভ কোনোদিন সংবরণ করতে পারে না—এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, ট্রাডিশনের জটিল ব্যাপারটিও রয়েছে। ট্রাডিশন-মোহগ্রস্ত লোকের পক্ষে নতুন কোনো ব্যাপার মেনে নেওয়া শক্ত ও সময়সাপেক্ষ। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি। ঐ হাওয়া গায়ে লাগিয়ে যাঁরা গান শিখেছেন তাঁরা ভাবেন তাঁরাই আসল ট্রাডিশনের অধিকারী—তাঁদের পক্ষে অন্য ধরনের হাওয়া বরদাস্ত

করা কঠিন। রবিঠাকুর অবশ্যি তাঁর বয়েস এবং অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত অনেকবার পালটিয়েছিলেন—নিজে স্বীকার করে গেছেন। রবিঠাকুর নেই—শান্তিনিকেতনও আগেকার মতো নেই—তাতে আর কী ক্ষতি ?

আশাকরি সবাই ভাল,

আদাবান্তে

এই চিঠির পরে মুরশিদসাহেবের কাছ থেকে আমার গানের রেকর্ড করার ব্যাপারে আর কোনো চিঠি পাইনি। তবে ২৮।১।৭৭ তারিখে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে তিনি কী একটি ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছেন। পরে আরেকটি চিঠির মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন যে তিনি 'ডক্টরেট' পেয়েছেন।

অন্যান্য রচয়িতাদের গানের রেকর্ড

১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, আমি নিজেই দুইটি গান লিখে এবং নিজেই সুর করে 'গুরু বন্দনা' নাম দিয়ে রেকর্ড করেছিলাম। কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই রেকর্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তা আগে একবার উল্লেখ করেছি।

তার বেশ কয়েকমাস পরে ১৯৭৩, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সনে আমি ষোলোটি গান (রবীন্দ্রসংগীত নয়) আমাদের রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করেছিলাম। রেকর্ড করার পর আমাদের রেকর্ডিং কোম্পানীর কর্তাদের এই গানগুলির ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে মৌখিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। গানগুলির রেকর্ড প্রকাশিতও হয়েছিল কিন্তু প্রচারের অব্যবস্থার ফলেই হোক কিংবা শ্রোতাদের আগ্রহের অভাবের জন্যই হোক—আমার মনে হয়েছিল রেকর্ডগুলি আশানুরূপভাবে সমাদৃত হয়নি। ওই রেকর্ডগুলির সব বিবরণ নিচে দিলাম :

১। Record No. L. H. 77—

১। ত্বমাদিদেব পুরুষঃপুরাণঃ—বেদগান

২। তুমি দেবাদিদেব—কথা ও সুর—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে } কথা ও সুর

৪। প্রণমামি অনাদি অনন্ত } জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। Record No. L.H. 164—

১। কোথায় যাবে তুমি গীতিকার—কবি বিষ্ণু দে

২। „ „ ২য় ভাগ।

৩। কিছু রঙ দিয়ো—গীতিকার—মনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। কে গো তুমি নাটুয়া—গীতিকার—কবি মণীন্দ্র রায়

সুরকার—অনাথবন্ধু দাস

৩। Record No. L. H. 168—

১। মহাসাগরের ডাক শুনেছি
২। বেলা শেষের বাঁশী
} রচনা—স্বামী সত্যানন্দ

৩। অনেক রক্ত ঝরেছে
৪। আলো চোখের আলো
} রচনা—অর্চন পুরী

সুর ও সংগীত পরিচালনা—প্রবীর মজুমদার

৪। Record No. 3226-0135A

(INRECO)

১। আমি আহত এক
২। কেন মনে হয়
৩। এত কেন ভুল হল
৪। আকাশটা তত দূরে নয়
} Lyrics, Bhawani Prasad Majumder
Tune : Anath Bandhu Das

অনেকের কাছেই শুনেছি যে তাঁরা আমার উপর্যুক্ত গানগুলি রেকর্ডের কোনো খবরই পাননি। তাছাড়া আমার বহুদিনকার পরিচিত অনেক বন্ধুবান্ধব এই গানগুলির কথা আমার কাছে শুনে উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার অনেক রেকর্ড ডিলারের দোকানে খোঁজ করেও ওই রেকর্ডগুলির কোনো সন্ধান পাননি বলে আমায় জানিয়েছিলেন। তাঁদের কাছেই শুনেছিলাম যে সেইসব রেকর্ডের দোকানের মালিকরাও

নাকি বলেছেন যে আমার ওই ধরনের রেকর্ড যে আছে তাও তাঁরা জানেন না। উপরে লেখা ৪নং রেকর্ডের গানগুলির রচয়িতা ভবানী-প্রসাদ মজুমদার আমায় অনেক দুঃখ করে বলেছেন যে তাঁর লেখা গানগুলির রেকর্ড কলকাতার বেতারকেন্দ্রেও নাকি বাজিয়ে শোনানো হয়নি। তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন যে বেতারকেন্দ্রের অফিসের লোকেরাও নাকি তাঁর গানের রেকর্ডের কোনো খবরই পাননি। তাই ভবানীবাবু এই ব্যাপারে কিছু করতে আমায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমি তখন ভবানীবাবুকে বলেছিলাম যে আমার আধুনিক গানের এবং ভক্তিগীতির রেকর্ডগুলির প্রচারের ব্যাপারে আমাদের রেকর্ডিং কোম্পানীর বেশ অনীহা আছে বলেই আমার মনে হয় কিন্তু এই অনীহার মূলে কী কারণ আছে তা আমার জানা নেই। তাছাড়া আমার নিজের গানের রেকর্ডগুলির ব্যাপারে কাউকে ধরাধরি করা অথবা কারোর অনুগ্রহ ভিক্ষা করার মতো মানসিকতা আমার একেবারেই নেই। ভবানীবাবুর জন্য আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। এসব ব্যাপারে কিছু করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না, এখনও নেই।

'বহুবিতর্কিত শিল্পী'

১৯৭৩ সন থেকেই আমার বিশেষ পরিচিত কলকাতার কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানোদ্যোক্তার এবং কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কাছে খবর পেতাম যে সাধারণ শ্রোতাদের আমার প্রতি আন্তরিক দরদ দেখে, কয়েকজন নামজাদা গায়কগায়িকা যাঁরা শান্তিনিকেতন এবং কলকাতার নামকরা রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠানে গান শিখেছেন, তাঁরা নাকি আমার গান সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। ১৯৭৪ সনে কলকাতার বাইরে একটি শহরে, কয়েকদিনব্যাপী একটি রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানে আমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যেদিন সন্ধ্যায় আমায় গান গাইতে হয়েছিল, সেদিন কী কারণে জানি না, আমার মনে হয়েছিল, আমি শ্রোতাদের খুশী করতে পারিনি—তাই মনটাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার পরের দিনই আমার কলকাতা ফিরে আসার কথা ছিল। সেদিনকার অনুষ্ঠানের শেষে, উদ্যোক্তাদের বিশেষ অনুরোধে আমি পরের দিনের অনুষ্ঠানেও গাইতে রাজী হয়েছিলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় যেখানে অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেখানে আমায় নিয়ে যাবার পর সবার অলক্ষ্যে একটু অন্ধকার জায়গায় চুপ করে বসে ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ অনুষ্ঠান চলার পর হঠাৎ মাইকে ঘোষণা করা হল—"আমাদের বিশেষ অনুরোধে দেবব্রত বিশ্বাস আজও আপনাদের গান শোনাবেন এবং এখন তিনি গাইবেন।" শ্রোতাদের উল্লাসের আওয়াজও পেলাম। মঞ্চে প্রবেশ করার সময় দেখলাম ও শুনতে

পেলাম, কয়েকজন শিল্পী ঘোষকমশাইকে পাকড়াও করে উত্তেজিত-ভাবে প্রশ্ন করছেন, "কেন ওঁকে তুদিন গাইতে দেওয়া হল ?"

এই ঘটনার পরেও, কলকাতার কয়েকটি বড় বড় অনুষ্ঠানে, কয়েকজন শিল্পীর এবং তাঁদের সাংবাদিক বন্ধুদের আমার সম্বন্ধে নানা ধরনের কটু মন্তব্য আমার নিজের কানে শুনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। আস্তে আস্তে আমার বোধগম্য হল যে আমার প্রতি শ্রোতাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসাই এই ব্যাপারে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর থেকে মনস্থির করলাম নিজেকে সংগীতজগৎ থেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেব এবং সেইভাবেই গুটিয়ে নিতে শুরু করলাম।

এতদিন জানতাম কোনো বিষয়ে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী পেতে হলে, সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, পরীক্ষা দিতে হয় ইত্যাদি। রবীন্দ্রসংগীত বা অন্য কোনো ধরনের গান, শান্তিনিকেতনের, কলকাতার, অথবা বাইরের কোনো সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখবার মত সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে কোনো কালেই জোটেনি এবং নামজাদা গায়ক হয়ে উঠবার উচ্চাভিলাষ আমার কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু কোনো ধরনের সংগীতশিক্ষা লাভ না করেই এবং সংগীত সম্বন্ধে কোনো ধরনের পরীক্ষা না দিয়েই আমি একটি চমকপ্রদ ডিপ্লোমা পেয়ে গিয়েছিলাম। কোন প্রতিষ্ঠান আমায় ডিপ্লোমাটি দিয়েছিলেন তা আমার জানা নেই। আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৯৭৪ সনের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই ডিপ্লোমাটি আমার কপালে জুটেছিল। কারণ সেই বৎসরের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে বেশ কয়েক মাস ধরেই আমার গান গাওয়ার ব্যাপারে নানা পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের মতামত প্রকাশিত হতে লাগলো। ফলে আমি যে ডিপ্লোমাটি পেয়ে ধন্য হলাম—সেই ডিপ্লোমাটি হল—'বহুবিতর্কিত শিল্পী'।

আমার গান : সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত

১৯৭৫ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে 'অমৃত' পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক সন্ধ্যা সেন হঠাৎ আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। সন্ধ্যা সেনের কথা আগে আমি উল্লেখ করেছি। সন্ধ্যাকে আমি তাঁর কলেজে পড়ার দিন থেকেই চিনতাম এবং তিনি আমার খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সন্ধ্যা আমার সম্বন্ধে কিছু তথ্যের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করাতে তাঁকে আমার চিঠিপত্রের একটি ফাইল দিয়ে বলে-ছিলাম ওই ফাইলটি থেকেই যেসব তথ্য প্রয়োজনীয় মনে হয় তা তিনি লিখে নিয়ে যেতে পারেন। আমি যা চিঠিপত্র লিখতাম তার কার্বন কপি আমি ফাইলে রেখে দিতাম। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ বসে বসে কী সব লিখলেন ; তারপর চলে গেলেন। 'অমৃত' পত্রিকায় পঁচিশে এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে 'সুরের আগুন' নাম দিয়ে একটি বেশ বড় প্রবন্ধ আমার সম্বন্ধে লিখে ছাপিয়ে দিলেন। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনারারী সেক্রেটারী এবং অন্যান্য পরিচিত লোকদের যেসব চিঠি লিখেছিলাম সেই সব চিঠির বিশেষ অংশ দিয়েই তিনি তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমি নিজে তাঁকে কিছুই বলিনি।

তারপর অনেক সাংবাদিক আমার ঘরে এসেছিলেন, আমায় নানা ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন—কিন্তু আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিনি।

১৯৭৫ সনে এবং ১৯৭৬ সনে নানা পত্রপত্রিকাতে আমার সম্বন্ধে

কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই লেখকদের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ও ছিল না। তারা কোনখান থেকে যে আমার সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতেন তা আমি জানতাম না।

সাংবাদিক নন অথবা কোনো সংবাদপত্র বা পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন অনেক পরিচিত ও অপরিচিত ভদ্রলোক এবং পরিচিতা, অপরিচিতা ভদ্রমহিলা আমার ঘরে আসতেন এবং এখনও আসেন। তাঁরা বলেন তাঁরা নাকি নানা পত্রপত্রিকায় এবং বহু অথরিটির মুখে আমার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য পড়েছেন এবং শুনেছেন। আমি নাকি রবীন্দ্রসংগীত বিকৃত করেছি, ভুল গাই, স্বরলিপি জানি না এবং আমার গান রীতিমতো অরাবীন্দ্রিক। এই সব ব্যাপারে আমার বক্তব্য তাঁরা জানতে চাইতেন এবং এখনো অনেকেই চান। তাঁদের আমি বলতাম এবং এখনো বলি যে, রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আমি যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ এককালে পেয়েছিলাম, তাঁদের অনেকেই আজ জীবিত নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল এবং অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়সূত্রে তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবীর ঠাকুর, প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রফুল্ল মহলানবীশ, সুধীরঞ্জন দাস, কালিদাস নাগ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমল হোম, শচীন কর, অনাদিকুমার দস্তিদার, সুপ্রভা রায় এবং বহু নামকরা ব্রাহ্ম। সুপ্রভা রায় তো আমার গান শুনে রীতিমতো কাঁদতেন আর বলতেন, "জর্জ, তোর গান শেখা সার্থক।" উপর্যুক্ত ভদ্রলোকদের এবং ভদ্রমহিলাদের আরো বলেছি যে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং এখনও জীবিত রয়েছেন, তাঁদের আমরা রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই জিজ্ঞেস করে দেখুন না—তাঁরা কী

বলেন। যাঁরা এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের নামও আমি সবাইকে বলি। তাঁরা হলেন—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, অমিয়া ঠাকুর, মাধুরী মহলানবীশ, কনক বিশ্বাস, সতীদেবী, প্রমথনাথ বিশী, পুলিনবিহারী সেন, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল সরকার এবং আরো অনেকেই। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীমশাই তো নিজেই আমার ঘরে এসে একটি ক্যাসেট (Cassette) দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য কিছু রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড করে দেবার জন্য। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আমি তো অরাবীন্দ্রিক, অনেকেই বলেন—আমার গান আপনি নেবেন কেন?" তখন উনি বলেছিলেন, "ওসব কথা বাদ দিন তো যদি দিনেন্দ্রনাথ অরাবীন্দ্রিক হন, এমনকি যদি রবীন্দ্রনাথও অরাবীন্দ্রিক হন, তাহলে আপনিও অরাবীন্দ্রিক।" আমি তখন হেসে বলেছিলাম, "এসব কথা খবরের কাগজে একটু প্রকাশ করে দিন না।" পরে গান রেকর্ড করে ক্যাসেটটি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। ১৯।৪।৭৪ তারিখে বিশীমশাই দিল্লী থেকে আমায় একটি চিঠি লিখেছিলেন—সেই চিঠির একটু অংশ তাঁদের পড়ে শুনিয়ে দিলাম। "দিল্লীর যে মানসিক মরুভূমির মধ্যে আমায় সময় সময় থাকতে হয়, সেখানে ফিতেয় তোলা আপনার কণ্ঠে গীত একগুচ্ছ গান আছে—সেগুলো এই মরুভূমির মরূদ্যান। হাজার বার শুনেও তৃপ্তি হয় না।" যাঁদের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম তাঁদের মধ্যে সবাই কি রবীন্দ্রসংগীতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন না? অথবা তাঁদের কি রবীন্দ্রসংগীতের রস উপলব্ধি বা উপভোগ করার মতো মন ও ক্ষমতা ছিল না? তাঁদের মানসিক অক্ষমতার জন্যই কি তাঁরা আমার রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ভঙ্গীকে এতো তারিফ করতেন? বর্তমান কালের অথরিটিরা বলে থাকেন আমি ভুল গাই। আমি একলাই কি ভুল গাই? অনেকেই ভুল গান করেন। যে সাহানাদেবীর প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমুখে করতেন,

সেই সাহানাদেবীর গান এবং রেকর্ড শুনুন—যদি স্বরলিপি বুঝতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন সাহানাদেবীরও ভুল গান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গান গাইতেন। আমি তো শুনেছি তিনি একজনাকে একটি গান শিখিয়ে দিলেন—যাঁকে শেখানো হল, তিনি তাঁর জ্ঞান মতো স্বরলিপি করে রাখলেন। আবার কয়েক মাস অথবা কয়েক বৎসর পরে সেই একই গান আরেকজনকে শিখিয়ে দিলেন—যাঁকে শেখানো হল তিনিও তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে স্বরলিপি করে রাখলেন। পরে দেখা গেল দুটো স্বরলিপির মধ্যে দুয়েক জায়গায় বেশ অমিল। তাহলে, হয় রবীন্দ্রনাথ ভুল গেয়েছিলেন বা কিছু অংশের সুর ভুলে গিয়েছিলেন কিংবা যাঁরা স্বরলিপি করেছিলেন তাঁদেরই ভুল হয়েছিল। তাই তো বলি—ভুল সকলেই করেন। আগরতলার নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ ১৯১৩ সনে শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন তাঁর বাল্যকালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গান শিখবার জন্য দিনেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নরেন্দ্রবাবু তাঁর স্মৃতিচারণে বলে ছিলেন, "দিনুবাবুও বলতেন, স্বরলিপি একটা স্ট্রাকচার মাত্র, গায়ককে এর ওপর প্রাণসঞ্চার করতে হবে। গুরুদেবের গলায় কত কাজ দেখেছিস? সবই কি স্বরলিপিতে দেওয়া যায়, না তা সম্ভব!" এই স্মৃতিচারণ ১৩৮২ সালের দেশ পত্রিকার ২৭ই আশ্বিন তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অমিয়া ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের নাতবৌ) বোধহয় তাঁর ৭০ বৎসর পার করে ফেলেছেন। তিনি এখনও গান করেন। এখনও তাঁর গলায় যা স্বাভাবিক কাজ বেরোয় তা স্বরলিপি করা তো দূরের কথা বর্তমান কালের অথরিটিরা কেউ তা নিজের গলায় গেয়ে দেখাতে পারবেন না।

সুতরাং অথরিটিরা নিজেরাই নিজেদের অথরিটি সাজিয়েছেন এবং বানিয়ে বানিয়ে সব থিওরি ও জ্ঞান বিতরণ করছেন। আমি যখন

১৯৩১ সন থেকে শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলির সময় শান্তিনিকেতনে যেতে আরম্ভ করলাম, তখন ওখানকার কোনো সংগীতানুষ্ঠানে সেই সব অথরিটিদের মুখও দেখতে পাইনি। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের অথরিটির সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৬ সনের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে শিলঙে ব্রাহ্ম কনফারেন্স হয়েছিল এবং সেখানে আমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হিরণ্ময় চৌধুরী নামক একটি যুবককে আমায় শিলঙ নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছিল। হিরণ্ময়বাবু কলকাতার রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠান 'গীতবিতান' থেকে ডিপ্লোমা পেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত আছেন।

নির্ধারিত দিনে শিলঙ পৌঁছে গেলাম—ওখানে বড়ুয়া স্যানাটোরিয়ামে আমায় রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি দুই বিছানাওয়ালা ঘর আমার এবং হিরণ্ময়বাবুর জন্য ঠিক করা ছিল। ঘরের বাইরে, দরজার ওপরে দেখলাম আমার নামটি বেশ বড় বড় করে লিখে একটি নেমপ্লেট লাগানো। তাঁর পরদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা থেকে এবং আসামের নানা অঞ্চল থেকে যত প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকারা ওই কনফারেন্সে যোগদান করতে এসেছিলেন তাঁদের প্রায় অনেকেই আমায় তাঁদের ভালোবাসা জানাতে আসতেন আমার কাছে।

একদিন একজন বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা আমার ঘরে এসেই বললেন, "ঘুঘুমাসীর সঙ্গে আপনি যখন ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে গাইতেন তখন থেকেই আপনার গান আমি শুনে আসছি। আমার একটি মেয়ে কলকাতায় থাকে—কলকাতায় মেয়ের কাছে

যখন যাই, খবরের কাগজে আপনার কোনো অনুষ্ঠানে গান গাইবার খবর পেলেই, যেমন করেই হোক টিকিট কিনবার ব্যবস্থা করতাম এবং আপনার গান শুনতে যেতাম।" আগেই একবার উল্লেখ করেছি আমার মায়ের ডাকনাম ছিল "ঘুঘু"। আমি তখন মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি তখন ময়মনসিংহে কী করতেন ?" তিনি বললেন, তিনি তখন সেখানে বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তেন এবং সান্ত্বনা তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন। সান্ত্বনা আমার নিজের দিদি, আমার চাইতে চার-পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম, "আপনি আমায় 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না—'তুমি' বলে সম্বোধন করলেই আমি খুব খুশি হব।" উনি রাজী হলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি যখন আমার মায়ের সঙ্গে ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরে গাইতাম তখন তো আমার বয়েস ছিল বারো-তেরো-চৌদ্দ; সেই সময়ের গানের কথা আপনি মনে রাখলেন কী করে ?" তিনি হেসে বললেন, "তোমার গান যে মনে রাখবার মতো তাতো তুমি জানতে না, সেজন্যই কলকাতায় গেলেই তোমার গান শুনতে যেতাম।" জিজ্ঞেস করে জানলাম, তাঁর নাম সুহাসিনী দাস ওখানে তাঁকে অনেকেই খুদিদি বলে ডাকতেন। তিনি গৌহাটিতেই থাকেন তাঁর এক মেয়ের কাছে।

সেই ব্রাহ্ম কনফারেন্সে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের পদস্থ কর্মচারী পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। একদিন তিনি আমায় বললেন, তিনি নাকি হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীকে একটি কড়া চিঠি পাঠাবেন। কারণ জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, আমার অনেকগুলি গান যা বোর্ড অনুমোদন করেছেন, সেগুলি রেকর্ডিং কোম্পানী প্রকাশ করছে না বলেই কড়া চিঠি দেবেন। আমি তখন বললাম, কড়া চিঠি দিলে কোনো লাভ হবে না কারণ

আমি নিজেই ওই গানগুলির রেকর্ড প্রকাশ করতে কোম্পানীকে নিষেধ করেছি। তখন পূর্ণেন্দুবাবু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কী করা যায় বলুন তো?" আমি তখন পূর্ণেন্দুবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজেই—এটা আপনি কি জানেন এবং মানেন?" উনি বললেন, "নিশ্চয়ই মানি।" আমি তখন তাঁকে বোঝালাম, "আমার জন্ম হয়েছিল ওই ব্রাহ্ম-সমাজেই; সেই সূত্রে রবীন্দ্রসংগীত আমার বড় ভাই। সেই বড় ভাইএর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আমার মায়ের কোলে বসে। এতো দীর্ঘকাল পরে আবার কি আমার বড় ভাইএর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে কয়েকজন গায়কগায়িকার মারফত, যারা আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট এবং যাঁদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোনো যোগা-যোগই নেই? এ ব্যাপারটিকে কি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব? তবে একটি উপায় আছে—আমি শুনেছি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে নাকি মিউজিক বোর্ডের একজন পরীক্ষকরূপে নেওয়া হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের অভিজ্ঞতা আমার চাইতে অনেক কম। কিন্তু আমাদের যৌবনকালে কলকাতার নানা রবীন্দ্রসংগীতের আখড়ায় জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হত। আমার রেকর্ডগুলির অনুমোদনের দায়িত্ব যদি জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে দেওয়া হয় তাহলেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।" আমার এই কথাগুলি শুনে পূর্ণেন্দুবাবু বিদায় নিলেন।

ব্রাহ্ম কনফারেন্স শেষ হয়ে গেলে কলকাতা ফিরে এলাম। ফিরে আসার কতদিন পরে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর নীরদবাবু আমার ঘরে এসে খবর দিলেন যে মিউজিক বোর্ড আমার যে গানগুলি অননুমোদিত ছিল সেই গানের টেপগুলি আবার চেয়ে পাঠিয়েছেন; কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সনের কিছু গানের টেপ

ভুলবশতই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তখন নীরদবাবুকে বলেছিলাম যে, যে টেপগুলি অক্ষত অবস্থায় আছে সেই টেপগুলি যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আমার যে সব গান বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আছে সেইগুলি কিছু কিছু ডিস্ক করিয়ে যেন প্রকাশ করা হয়। ১৯৭৭ সনের রবীন্দ্রজন্মোৎসবের আগেই হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানী অনুমোদিত করা ছয়টি গানের একটি Mini L.P. রেকর্ড প্রকাশ করেছিল।

চিঠিপত্র : দ্বিতীয় কিস্তি

১৯৭৬ সনের কোন মাসে আমার মনে পড়ছে না, সমীরণ চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোক আমার ঘরে এসে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন। রবীন্দ্রসংগীত আসরগুলিতে আমাকে আগের মতো দেখা এবং পাওয়া যাচ্ছে না কেন তাও জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুরের কাছে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বাস করেন এবং ওখানকার একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি নাকি নানা পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কাজ করেন। তাঁকে আমি সব ব্যাপার খুলে বললাম।

সমীরণ চৌধুরী ১৬-১১-৭৬ তারিখে আমায় একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন তাঁর গ্রাম বৈকুণ্ঠপুর থেকে। চিঠিখানা হল :

রবীন্দ্রসংগীত সাধকোত্তমেষু,

আপনি আসরেও আর রবীন্দ্রসংগীত গাইবেন না শুনে যা মনে হয়েছিল তা গুছিয়ে লেখা আমার সাধ্যাতীত। তাছাড়া, অনুভূতির বাহন ইঙ্গিত, কবিতা ছাড়া তার প্রকাশ নেই।

আজ সারা সকাল আপনার গান শুনেছি। সংক্ষেপে বলি : নতুন গান আপনি আর শোনাবেন না; তাই যা শুনেছি, শুনছি এবং বারবার শুনব তা নিয়ে কেবলই অনুভব আর ভাবনার মিতালি। অনুভূতিহীন, আইনী ক্ষমতায় আসীন, যাঁরা আজ আপনাকে রেকর্ড করতে দিল না, তাঁরা ঠিক

উলটো বুকনিতে একদিন বাংলা বাচাল হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই। আমি নিশ্চিত দেখে যাব। কিন্তু কাব্যগীতির যে ভাষাতীত নিটোল সৌন্দর্য আপনার গহন গভীর প্রেমাহত কণ্ঠে আকুল বেদনাতীত আনন্দরসে আমাদের বেঁচে থাকার, নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগায়, তা বিচিত্রতর ঐশ্বর্যে আরও মহিমান্বিত হয়ে থাকার সুযোগ পেল না—এ লজ্জা অনপনেয়। এ ক্ষতি অপরিমেয়। সকলের হয়ে এই মদগর্বী মূঢ়তার জন্য করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

আপনার গাওয়া গান নিয়ে একদিন তোলপাড় হবে, একটু ভিন্ন অর্থে। ধরা যাক, আপনার পরিকল্পিত মৃ্যজিক। একটা উদাহরণ নিচ্ছি—'সে যে বাহির হল আমি জানি জানি'র প্রকাশে তীব্র বেদনা সংহত ভাব গম্ভীর। প্রান্তরিক বিচলনের আভাস, অন্তর্গূঢ় হাহাকার মর্মে লাগে। রেকর্ড-এর শুরুতে ব্যবহৃত সুরে এই আন্তর বিচলন মর্মরিত। অথচ গানটির শ্রাব্যস্বরের সঙ্গে সংগতি রেখে আকুলতা-ছোঁয়ানো শান্ত সুর ব্যবহার করলে বেমানান হত কী? হয়তো হত না। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মানানসই হয়ে ওঠাই কি লক্ষ্য? এই গানের অন্তরে ব্যক্তিক বঞ্চনার নৈর্ব্যক্তিক হা-হা-ধ্বনি গুঞ্জরিত—নইলে তা সৃষ্টি হত না—তাই প্রারম্ভিক সুরে গুঞ্জরিত হয়ে আমাদের প্রস্তুত করে নেয়। হারমোনিয়াম বা এসরাজ-এ প্রথম কলি বাজানো? সে বড় নিষ্প্রাণ ব্যাপার।

'আমার একটি কথা বাঁশি জানে'ও রোমান্টিক অনুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ। এ গানে 'জাগার সাথি' না পাওয়ার ব্যক্তিগত বেদনা নৈর্ব্যক্তিক বাঁশির সুরে, সেই সৃষ্টিতে, চিরায়ত হয়ে থাকার গভীর সান্ত্বনা অনুরণিত। এ গানের মৃ্যজিক তাই আপনার কল্পনায় করুণ-মধুর প্রাপ্তিতে বিভোর। মৃ্যজিক-এ আপনার অ-ভাবিতপূর্ব নান্দনিক সুষমাবোধ নিয়ে কজন ভাবীকালে 'পি. এইচ. ডি' পাবেন কে জানে।

কিছুদিন হল আমাদের দুর্ভাগ্যের তালিকা ক্রমবর্ধমান। ঋত্বিক ঘটক চলে গেলেন। তারপর শম্ভু মিত্র নতুন নাটক করা বন্ধ করলেন। এখন অভিনয়ও করছেন মাঝে মাঝে। আবৃত্তি করতে আর শুনি না।

সবশেষে শুনলাম আপনার গান না গাওয়ার সিদ্ধান্ত। যেহেতু নাটকের চেয়ে গান আমাকে টানে বেশি, সেজন্যই বোধহয় আপনার মৌনতা আমাকে সব চেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে।

আপনার কাছ থেকে পেয়েছি অনেক, অনেক। এবং আরও পাব। সেই প্রাপ্তির শ্রদ্ধান্বিত প্রণাম পাঠালাম :

"নিজেকে ছাড়িয়ে পাওয়া নিজেকেই"

তুমিতো বলবে না, জানি ;
সব কথা বলাও যায় না।
তাই দুঃসহ নিবিড় ছায়া
সুরের আকাশে মেলে দাও ;
দূরবত্নন্নত ধ্বনি অস্তিত্বের গভীর গমকে কিছু চেনা,
অনেক অজানা গূঢ় অনুভব, মিড়ের প্রণয়ে আলিঙ্গন—
রাগরক্তময় আলোড়িত ঘূর্ণি সোহাগের—বেঁধে রাখে,
কখনও বা টনটন্ করে বেদনায় ॥···

ইতি স্নেহার্থী সমীরণ।

এই কবিতাটি আরো লম্বা—তাই সবটা দিলাম না। সমীরণবাবুর চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম :

১৭৪ই রাসবিহারী এ্যাঃ
কলিকাতা-২৯
১৭-১১-৭৬

প্রীতিভাজনেষু সমীরণবাবু—

আপনার নিজেকে ছাড়িয়ে নিজেকে পাওয়ার প্রলাপ হাতে এল—মনে হল—কতকগুলি ব্যাপারে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনার কাব্যঠাসা-হৃদয় অনেক কাল্পনিক তথ্য সৃষ্টি করেছে—এবং তা নিয়ে আপনি অনর্থক মাথা ঘামিয়েছেন। কী একটা কাগজেও অনেক কিছু লিখেছিলেন এবং সেই

ছাপানো কাগজও আমায় পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু ওসব ব্যাপার নিয়ে আমি একদম মাথা ঘামাইনে। ভুল বুঝেছেন এটুকুই শুধু বলতে পারি। লিখেছেন —"আইনী ক্ষমতায় আসীন, যাঁরা আজ আপনাকে রেকর্ড করতে দিল না —" ভীষণ ভুল ধারণা—আমার রেকর্ড করা কেউ বন্ধ করেনি—অন্য সবার মতো আমি যত ইচ্ছে রেকর্ড করে যেতে পারি—কিন্তু **আমি নিজেই রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছি।** কী কারণে বন্ধ করেছি তা আপনার জানা উচিত—কারণ আমার মতামত শ্রীমতী সন্ধ্যা সেন সবই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এবার একটি সহজ উদাহরণ দিই—ধরুন—আমি চলেছি—আমার পা মাটিতে বাধা পায়—মাটির বাধাকে অতিক্রম করেই আমি হাঁটি—তাতেই আমার চলা হয়। আমার এই চলার পথে যদি দেখি শক্ত একটি উঁচু দেয়াল —বাধা পাই, তাই থামতে হয়। তখন আমার সামনে তিনটে পথ খোলা—
১নং—নিজের সৌন্দর্যবোধ, শালীনতাবোধ সব বিসর্জন দিয়ে ঐ দেয়াল নির্মাতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগিরণ করা বা তাদের সঙ্গে রসনায় এবং কলমে লাঠালাঠি করা—
কিংবা ২নং—সেই দেয়ালের কাছে নতি স্বীকার করে দেয়ালের নিচে একটি সুড়ঙ্গ-পথ খুঁড়ে মাথা নিচু করে পথ চলা—
কিংবা ৩নং—একটি সিঁড়ি বানিয়ে, মাথা উঁচু করে দেয়াল অতিক্রম করে আবার চলা।
আমার চলার ক্ষেত্রে ঐ শক্ত উঁচু দেয়ালটি হল—শান্তিনিকেতনী সংস্কারের ভূত-কাঁধে-চেপে বসা কয়েকটি লোকের মস্তিষ্কপ্রসূত ভূত কালের ভূতে-পাওয়া ধারণা। আপনার বিচারে উপরোক্ত তিনটি পথের কোন পথটি আমার অবলম্বন করা উচিত তা আমি জানি না। যে মানসিকতা আমার ভেতরে জন্মেছে এবং বড় হয়ে উঠেছে সেই মানসিকতা নিয়ে, তিন নম্বরের পথটি ছাড়া আর আমার কোনো উপায়ই নেই অর্থাৎ সিঁড়ি বানিয়ে মাথা উঁচু করে দেয়ালটি টপকে যাওয়া। কিন্তু সিঁড়ি বানাতে সময় লাগবে—যদি বানাতে পারি মাথা উঁচু করে আবার পথ চলা শুরু করব ; যদি না পারি

নিজের অক্ষমতাকেই দায়ী করব—অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাব না। সমীরণ-বাবু—আমি পঁয়ষট্টি বছর পার করেছি, ছেষট্টি চলছে। আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে—সংক্ষেপে কিছু আপনাকে জানাই। আপনার জীবনেও হয়তো তার সঙ্গে কিছু মিল থাকতে পারে।

আমাদের জীবনে আমরা যা পাই তা যে সব সময় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবেই তাতো নয়। শুধুমাত্র ন্যায়সঙ্গত ন্যায্যটুকু পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট সেতো হয়ে ওঠে না—হলেও তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে অথবা মঙ্গলও হয় না। যাকে আমরা অন্যায় এবং অবিচার বলি তাকে গ্রহণ করতে হবে। এই অন্যায় ও অবিচারকে উপযুক্তভাবে গ্রহণ করবার শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের থাকা চাই—না থাকলে অর্জন করতে হবে—অক্ষম হলে সহ্য করতে হবে। শুধু পরস্পরের নিন্দা অথবা পরস্পরকে গালিগালাজ করলে কোনো সুরাহা হয় কিনা জানি না—তবে এতে তিক্ততাই বাড়ে এটুকু বলতে পারি।

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কারান্তে.

জর্জদা

রেকর্ডে আমি যে সব বাদ্যযন্ত্র যেভাবে ব্যবহার করেছি সে সম্বন্ধে সমীরণবাবু যা লিখেছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে আমি কোনো মতামত প্রকাশ করিনি। কারণ ওই সব বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি এবং সুর তাঁর হৃদয়ে কী ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানবার তো আমার কোনো উপায় নেই।

আমার ১৭।১১।৭৬ তারিখের চিঠি পেয়েই সমীরণবাবু (সমীরণ চৌধুরী) আবার ২১।১১।৭৬ তারিখে একটি লম্বা চিঠি পাঠালেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু জর্জদা,

আপনার চিঠি পেয়েছি।

আপনি বলেছেন—'এই অন্যায় ও অবিচারকে উপযুক্তভাবে গ্রহণ করার শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের থাকা চাই—না থাকলে অর্জন করতে

হবে—অক্ষম হলে সহ্য করতে হবে।' একথা নিঃশব্দে মেনে নিতে হয়, জীবনচর্যায় প্রতিফলিত করতে হয়। আমার বিশ্বাস, মহত্ত্বের বিকশিত মনুষ্যত্বের এটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের সম্বন্ধে সামান্য যা পড়েছি তাতে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনার উপলব্ধিতে অভিন্ন সুর বেজেছে—কৃতজ্ঞ চিত্তে, নম্র হয়ে তা মাথা পেতে নিলাম।

অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করি এর সত্যতা ; তবে এও ঠিক যে, জীবনে এই উপলব্ধি যা আপনার ছেষট্টি বছরের সত্যনিষ্ঠ জীবনচর্যার সার—স্বীকরণ করতে সময় লাগবে। জেনেশুনে নিজেকে ঠকাতে মন চায় না ; আমি যে খুব সাধারণ তা চোখ ঠেরে ভোলা যাবে না। আশীর্বাদ করুন, কোনো-না কোনো দিন যেন এই গভীরতায় বাঁচতে পারি।

সত্য ভাষণের খাতিরে একটা কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়া উচিত—যে কোনো বিষয়ে বুঝতে আমার সময় লাগে। বহু বিষয় আদৌ বুঝি না। আমার তুখোড় সহপাঠী বন্ধুরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি স্কুল টিচার। বুদ্ধিমান কেউ কবিতা আর গান নিয়ে পড়ে থাকে কি ? এবং প্রলাপ বকা দূরে থাক, তার আভাস পেলেই নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। এটা আমি জানি অথচ আপনি···

ভুল বোঝা আমার পক্ষে স্বাভাবিক ; এই ব্যাপারটা আমার স্বভাবে বুদ্ধির ঘাটতিতে আছে।

সেই ভরসায় আমার লেখা নিয়ে দু'একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আপনাকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। কেউ তা না করলে কিছু বলার নেই। লোকভেদের রুচি ভিন্ন হতে বাধ্য। কেউ যদি আপনাকে আপমান করে—তখন ? ব্যক্তিগতভাবে আপনার কোন বক্তব্য নেই, সিঁড়ি বানিয়ে মাথা উঁচু করে সেই বাধা টপকে যাওয়াই একমাত্র করণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় আজীবন প্রত্যহের কুশাঙ্কুর নীরবে সহ্য করে গেছেন। কবিকে যাঁরা ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের অনেকে কবির সপক্ষে যে সরস, কখনও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আয়ুধ নিক্ষেপ করেছিলেন তা কি অযৌক্তিক ?

সত্যিকার শ্রদ্ধা, আমার মনে হয়, শ্রদ্ধাস্পদকে ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের চেনা মানুষটির প্রত্যহিকতা ভেদ করে এমন একটা অনুভূতির জগতে পৌঁছয় যেখানে শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধার আন্তর হেতু একাকার হয়ে একটা নতুন ডায়মেন্‌শন্ পায়। সেই জায়গায় কেউ আঘাত দিলে আমার মত সাধারণের পক্ষে আত্মসংযম দুঃসাধ্য।

সুরশিল্পীকে তাঁর সহজ আত্মপ্রকাশে বাধা দেওয়ার চেয়ে বড় অপমান কি হতে পারে? এটাই বড় বেশি বাজে। চিঠিতে আপনি যে শান্তিনিকেতনী সংস্কারের ভূত-কাঁধে চেপে-বসা কয়েকটি লোকের মস্তিষ্ক-প্রসূত ভূত কালের ভূতে পাওয়া ধারণা' বলেছেন, আমার প্রতিবাদ তারই বিরুদ্ধে। ভূত বলেই তা বর্তমানের পথরোধ করে ভবিষ্যতের সমূহ সর্বনাশ ঘনিয়ে তোলার অপচেষ্টা করতে থাকে। আমার কাগুজে প্রতিবাদ নৈতিক। দয়া করে বিশ্বাস করবেন, 'পরস্পরের নিন্দা অথবা পরস্পরকে গালিগালাজ' করার মত কোনও দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। হয়তো নিজের অজান্তে কটুবাক্য ব্যবহার করেছি তা হলে লজ্জিত হব। যাই হোক এ ব্যাপারে এখন আর লিখব না। পরে বহুকাল পরে···থাক সে প্রসঙ্গ।

আপনার কণ্ঠে আর নতুন রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পাব না।—এত বড় একটা ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায় বোধ করি।···আপনার আর গান না গাওয়ার ব্যাপারটা কিছুতেই শান্ত মনে মেনে নিতে পারছি না, এ ক্ষতি তো আমার একার নয় জর্জদা; এর অংশীদার এমনকি আপনার বর্ণিত শান্তিনিকেতনী সংস্কারের ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিরাও।···

আপনি আমার আন্তরিক প্রণাম নেবেন।

ইতি স্নেহার্থী সমীরণ

সমীরণ চৌধুরী মহাশয়ের ২১।১১।৭৬ তারিখের চিঠির জবাবে আমার উত্তর :

174E Rasbehari avn.
Cal-29
25/11/76

প্রীতিভাজনেষু সমীরণবাবু—

বোঝা গেল, আপনি আমার কথা কিছুটা মেনে নিয়েছেন। মনে হচ্ছে আপনার মনে তবুও বেশ খটকা রয়ে গেছে। আমায় জানিয়েছেন আপনি আমায় শ্রদ্ধা করেন—তাই কেউ যদি আমায় অপমান করেন কিংবা আপনার শ্রদ্ধার ব্যাপারে আপনার মনের ভেতরে যে নতুন 'ডাইমেন্‌শন্‌' গড়ে উঠেছে তাতে যদি কেউ আঘাত দেয় তাহলে আপনার মতো সাধারণের পক্ষে আত্মসংযম দুঃসাধ্য। আরো লিখেছেন—"ভূত বলেই তা বর্তমানের পথরোধ করে ভবিষ্যতের সমূহ সর্বনাশ ঘনিয়ে তোলার অপচেষ্টা করতে থাকে, আমার কাণ্ডজে প্রতিবাদ নৈতিক" নিজেকে সাধারণ বলে জাহির করেছেন বটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারে আপনি দুই রকমের অসাধারণ দায়িত্ব কাঁধে নিতে চাইছেন। পয়লা নম্বর দায়িত্ব হল, আপনি নিজেই ম্যাজিস্ট্রেট সেজে বিচারের ভার কাঁধে নিয়ে আসামীদের শাস্তি দিতে চাইছেন। আর দুই নম্বর হল—সংস্কারের ভূত যাতে ভবিষ্যতে ক্ষতি সাধন না করতে পারে তার জন্যে নিজেই একটি শক্তিশালী ওঝা হয়ে ভূত তাড়াবার চেষ্টা করতে চাইছেন।

সমীরণবাবু—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই সব সাংস্কৃতিক ব্যাপারে আসল বিচারের ভার রয়েছে একটি সুপ্রীম কোর্টের ওপর—সেই সুপ্রীম কোর্টের নাম হল 'মহাকালের সুপ্রীম কোর্ট।' আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি এসব ব্যাপার নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে নিজের মনে উত্তেজনা বাড়াবেন না কারণ তাতে মনের অশান্তি তো বেড়েই যায়, তাছাড়া উত্তেজনায় রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে আপনার স্বাস্থ্যেরও সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারে। সংসারী হয়েছেন—নিজের সংসারের দায়িত্ব, অধ্যাপনার কাজের ভেতর দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব এবং আরো কত দায়িত্বের কাজ আপনার নিশ্চয়ই আছে। ভূত তাড়াবার মতো

একটি অতি তুচ্ছ দায়িত্বের জন্য আপনার এতো আগ্রহ আপনাকে ঠিক মানায় না। লিখেছেন—"আমি স্কুল টীচার। বুদ্ধিমান কেউ কবিতা আর গান নিয়ে পড়ে থাকে কি ?" আপনাদের রবিঠাকুর মশাই তো প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে জীবনের বেশীর ভাগ সময়ে ঐ কবিতা আর গান নিয়েই মশগুল ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি কি আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত সহপাঠী বন্ধুদের চাইতে কিছু কম ছিল ? আমি অবশ্যি ঠিক জানি না।

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার রইল—

জর্জদা

আমার এই চিঠি পাবার পর সমীরণবাবু বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা জুড়ে একটি একাঙ্ক নাটক লিখে পাঠালেন ১।১২।৭৬ তারিখে। সেই নাটকটি পুরো লিখে কোন লাভ নেই কিন্তু তাঁর চিঠির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করছি :

"রবীন্দ্রসংগীত জগতে ফ্যাসিজম-এর ভূতগ্রস্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আপনি—একা। একেই তো বলে 'খড়্‌গে খড়্‌গে ভীম পরিচয়।' ওদের হাতে একটা খড়্‌গ, আর একটা আপনার হাতে। দুই খড়্‌গে কিন্তু মৌল পার্থক্য বিদ্যমান।"…

সমীরণবাবুকে ৯।১২।৭৬ তারিখে যে চিঠি লিখেছিলাম তা হল।

প্রীতিভাজনেষু সমীরণবাবু—

এতোদিন আপনাকে কবি বলেই জানতাম। এবার আপনার চিঠিতে এলেন নাট্যকারের বেশে। যে একাঙ্ক নাটিকাটি পাঠিয়েছেন তার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমার নেই—তবে এটুকু বলতে পারি যে উপমাটি একেবারেই ভুল। আমার হাতে একটি খড়্‌গ গুঁজে দিয়ে যোদ্ধা সাজিয়ে একটি মারাত্মক ভুল করেছেন। আমার আগের চিঠিতে আমি আভাস দিয়েছিলাম যে যোদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করার মতো

মানসিকতা আমার একদম নেই। সুতরাং আমায় যোদ্ধার ভূমিকায় নামিয়ে মারাত্মক ভুল তো করেছেনই—অনর্থক কিছু অর্থহীন প্যাচালে নিজেকে জড়িয়েছেন। আপনাকে আগেও বলেছি এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো আপনাকে ঠিক মানায় না। তাছাড়া, অবাস্তব কিছু তথ্য কল্পনা করে নিজের ঘরে বসে আপনার মনে রাগারাগি করে মুক্ত হতে চাইছেন বটে কিন্তু এতে মুক্তি নেই।

আপনি কবি—আশা করব বিশ্বকবির বিচিত্র সৃষ্টিলীলা আপনার কবিত্ব ঠাসা মনের চোখে কিছু কিছু ধরা পড়েছে। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে সেই সৃষ্টিলীলায় (কি কারণে জানি না) সৃষ্ট হয়েছিল জল-স্থল আকাশ বাতাস-মানুষ প্রাণী। কিন্তু আরো আশ্চর্য মানুষ পেলো Animality এবং Rationality। সমুদ্র মানুষের পথরোধ করেছিল বলে মানুষ কখনও সমুদ্রকে পুড়িয়ে ফেলতে চায়নি—কোনো দেশের বৈজ্ঞানিকরাও সমুদ্র সেচন করে ধ্বংস করার পথ বাৎলায়নি। বরঞ্চ নৌকো, জাহাজ তৈরী করে পাড়ি দিয়েছে। মানুষ আকাশটা উঁচু বলে তাকে নিচে টেনে নামায়নি—পাখির মতো মানুষ উড়ছে। বাকীটা আপনি নিজে ভেবে ঠিক করে নেবেন।

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই—

জর্জদা

এই সব চিঠির পরেও সমীরণবাবু আমায় নানা ধরনের প্রশ্ন করে কয়েকটি চিঠি লিখেছেন—তবে সেই চিঠিগুলির এখন আর উল্লেখ করলাম না।

১৯৭৭ সনে আমি কলকাতায় একটি কিংবা দুটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই সব অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে আমার নাম ছাপানো ছিল না। তবে ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবগুলিতে ব্রহ্মমন্দিরে এখনও গান গাইতে যাই যদি আমার স্বাস্থ্য কোনো বিপত্তি সৃষ্টি না

করে। রবীন্দ্রজন্মোৎসবগুলিতে গান গাওয়া অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ১৯৭৮ সনের ২৫শে বৈশাখ (৯ই মে) সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে আমি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি আধ্যাত্মিক গান গেয়েছিলাম। ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে আগে কখনো রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালিত হয়েছে বলে আমি কোনো খবর পাইনি।

“দেবব্রত বিশ্বাসের অপরাধ কি ?”

১৯৭৭ সনের মে মাসের গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা ‘যুগান্তর’এর একজন স্টাফ রিপোর্টার আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। সাধারণত খবরের কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো সঙ্গে আমি রবীন্দ্রসংগীত অথবা আমার গানের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে রাজী হই না। কিন্তু সেদিন ‘যুগান্তর’ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মহাশয় আমায় নানা ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন এবং আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম। ১৯৭৭ সনের পঁচিশে বৈশাখ (৮ই মে) তারিখের ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে একটি বিবৃতি বার করে দিলেন। তাতে দেখলাম আমি যে সব তথ্য বলেছিলাম তার থেকে কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি যা লিখেছেন তা নিচে দিলাম।

‘দেবব্রত বিশ্বাসের অপরাধ কি ?’

দেবব্রত বিশ্বাস গত আট বছর রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেননি ; তাঁর বেশ কিছু গান একটি কোম্পানী রেকর্ড করে রেখেছেন। কয়েকটি গান সম্পর্কে মিউজিক বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা বিরূপ অভিমত দেওয়ায় এই প্রবীণ ও জনপ্রিয় শিল্পীর রেকর্ড করা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে শিল্পীর বা রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের মধ্যে দু একটি চিঠি চালাচালি হয়েছে মাত্র। অচলাবস্থার অবসান ঘটেনি।

এই পঁচিশে বৈশাখের প্রাক্কালে দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে গিয়েছিলাম একটি প্রশ্ন নিয়ে। আপনি কেন, নতুন করে রেকর্ড করছেন না, বাধা কোথায়? পঁয়ষট্টি বছর বয়স হলেও তিনি রোজ গান করেন। অনুরোধে গানও শোনান, এই অভিজ্ঞ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর রেকর্ডের চাহিদা আছে; অনেক ভক্ত আছেন তাঁর; আবার তাঁকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিতর্ক; তবু ওই বিতর্কিত শিল্পীর দরাজ কণ্ঠস্বর আর গানের ভাব শ্রোতাদের অনেকেরই প্রিয়।

নতুন অভিজ্ঞতা হল; শ্রীবিশ্বাস অতীতের মত মুখ বন্ধ করেননি এবার; কথা বললেন, কথার উত্তর দিলেন; তাঁর সঙ্গে আলোচনা থেকে একটি কথা পরিষ্কার হল—তা হচ্ছে রেকর্ড পরীক্ষার পদ্ধতি বা বিচারক নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি আছে; তা হচ্ছে এই—প্রবীণ শিল্পীর চেয়ে বয়সে এবং গানের জগতে কম বয়সের শিল্পী দিয়ে রেকর্ড যাচাই বা পরীক্ষায় তাঁর আপত্তি। প্রশ্ন করলাম—নতুন বিশেষজ্ঞদের তালিকায় তো তাঁর সমবয়সী প্রবীণ ব্যক্তিও আছেন, তাই প্রবীণদের দিয়ে রেকর্ড পরীক্ষার ব্যাপারে কি আপত্তি আছে? তিনি বললেন—না, নেই; তবে আমার চেয়ে অভিজ্ঞতায় আর বয়সে ছোট কারো কাছে আমি পরীক্ষা দিতে রাজি নই।

দেবব্রত বিশ্বাসের এই আপত্তি ছাড়াও একটা অভিমান কাজ করছে বলে মনে হল; তা হচ্ছে আগে যাঁরা বা যিনি রেকর্ড দেখতেন, তাঁদের পদ্ধতিই আলাদা ছিল। আমার গানে কোন জিনিসে আপত্তি থাকলে তিনি নিজে কথা বলতেন; আলোচনা করতেন; তাছাড়া তখন পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা ফরম্যালিটি মাত্র; আজ তা নেই। এখন এটা রীতিমত পরীক্ষার ব্যাপার। এখানেই শ্রীবিশ্বাসের আপত্তি।

তিনি সামনের হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গানও গাইলেন। রোজ গান করেন। কয়েকশো গান বাছাই করে টেপ করে রেখে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি যত রবীন্দ্রসংগীত জানেন, সেগুলি বিষয় অনুযায়ী টেপে তুলে রাখবেন। কিছু নমুনাও শোনালেন।

বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিয়ম আছে; আছে মিউজিক বোর্ড; থাকা অবশ্যই দরকার অরাজকতা বন্ধ করতে।

বিশ্বাসের অপরাধ কোথায় তা অনেকেই জানতে চান। চারটি গান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। আপত্তি বেশী বাজনার জন্যে, গানের লয় নিয়ে একটি গান ঢালা সুরে গাইতে বলা হয়েছে, আর একটিতে বলা হয়েছে স্বরবিতান অনুসারে গান গাওয়া হয়নি। কিন্তু কোথায় স্বরবিতান থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে তা বলা হয়নি। বহু নামী শিল্পী, এমনকি শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত এবং শান্তিনিকেতনে বর্তমানে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এমন শিল্পীদের গান আর স্বরবিতানে আকাশ পাতাল পার্থক্য। সে সব গানের তালিকা নেহাত কম নয়। তবে?'

বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি সংক্রান্ত পত্রাবলী—তৃতীয় কিস্তি

'যুগান্তর' পত্রিকায় এই বিবৃতি প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরেই ১০নং প্রিটোরিয়া স্ট্রীট কলিকাতায় অবস্থিত বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের একটি বাংলায় টাইপ করা চিঠি আমি পেয়েছিলাম। চিঠিখানার তারিখ ছিল ১৯।২০ মে ১৯৭৭ এবং চিঠিখানায় স্বাক্ষর করেছিলেন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনারারী সেক্রেটারী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

সেই চিঠিখানা :

VISVA-BHARATI
MUSIC BOARD

10 Pretoria Street
Calcutta 100071

এম, বি/২৭৭

১৯/২০ মে-১৯৭৭

কল্যাণীয়

প্রিয় জর্জ,

ইতিপূর্বে তোমার দুখানি চিঠি সরাসরি আমার আপিসে আসে। ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য কয়েক বছর আগেই তোমাকে আমার আপিসে এসে দেখা করবার জন্য অনুরোধ করি। এই সব চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয় ১৯৭৪ সালে। কিন্তু তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় - কিন্তু তোমার পক্ষেও একদিন

সুবিধা করে এসে এই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নি। তোমার আসার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর তথ্যাদি প্রকাশিত হল।

বিশ্বভারতীর সংগীত সমিতির আপিসে তোমার লেখা চিঠিপত্র একদফা পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ২৮।৯।৭৬ তারিখে পাঠাই। এবং আরেক দফা চিঠিপত্র তাঁর কাছে ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ তারিখে পাঠাই। ইতিমধ্যে ১লা ২রা অকটোবর ১৯৭৬ শিলঙের ব্রাহ্ম কনফারেন্স উপলক্ষে তোমার সঙ্গে পূর্ণেন্দুর এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সময় তোমাকে জানানো হয় যে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকটস্—যাঁরা তোমার গানের রেকর্ড করবার জন্য তোমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ—তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে অন্তত গুরুদেবের ১৯টি গানের সুর মিউজিক বোর্ড থেকে অনুমোদন করা আছে কিন্তু তাঁরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেই সব গানের রেকর্ড বাজারে ছাড়তে পারেননি। তখন পূর্ণেন্দুকে তুমি বল যে তোমারই ইচ্ছানুযায়ী ঐ সব রেকর্ড বাজারে ছাড়া হয়নি।

যে তিনটি গানের সুর অনুমোদিত হয়নি—সে সম্পর্কেও তোমার সঙ্গে পূর্ণেন্দুর কথা হয়। পূর্ণেন্দু কলকাতায় ফিরে এসে পূজোর ছুটির পর হিন্দুস্থান কোং-র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার এই বিষয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। যে গান তিনটির সুর অনুমোদিত হয়নি সেগুলি পুনঃ পরীক্ষার জন্য টেপগুলি সংগীত সমিতির আপিসে পাঠাতে বলা হয়েছিল কিন্তু এতদিন তাঁরা এই বিষয়ে অগ্রণী হন নি। গুরুদেবের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে এবারে ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে তোমাকে গান গাইতে অনুরোধ করবার জন্য পূর্ণেন্দু তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার শারীরিক অপটুতার জন্য তুমি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছিলে। তখনও তোমার রেকর্ড করা ১৯টি গুরুদেবের গান—যেগুলির সুর অনুমোদিত হয়েছে সেগুলি এবং তিনটি গান যেগুলির সুর অনুমোদিত হয়নি সে সম্পর্কেও পূর্ণেন্দু তোমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২৫শে বৈশাখ, ৮মে ১৯৭৭ তারিখে যুগান্তর পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টারের তোমার গানের রেকর্ড করা সম্পর্কে একটি বিবৃতি ছাপা হয়েছে। এই বিবৃতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইতিপূর্বে পূর্ণেন্দু তোমার সঙ্গে শিলঙে এবং কলকাতায় ২৫শে বৈশাখের প্রাক্‌কালে তোমার সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

গুরুদেবের গানের রেকর্ডের স্বর অনুমোদন সম্পর্কে বহুদিন ধরেই বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে আসছেন। এখনও সেই নীতি অপরিবর্তিত আছে। স্বর অনুমোদনের জন্য রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের (এক্স্‌পোনেণ্টস্) রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞ মতামত (এক্স্‌পার্ট ওপিনিয়ন্) দেওয়া হয়। বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি এইসব বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেন। যে সব বিশেষজ্ঞরা স্বর পরীক্ষা করে মতামত দেন তাঁদের বিষয় বিশেষভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। এই নীতি তো বরাবরই অনুসৃত হয়ে আসছে। স্বতরাং পূর্বের এবং বর্তমানের স্বর অনুমোদনের পদ্ধতির মধ্যে কোনও প্রকার তারতম্য না থাকারই কথা। তাছাড়া রেকর্ড কোম্পানীগুলির সঙ্গে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির কতকগুলি সর্তসম্বলিত চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। কোন্ রেকর্ড কোং কোন্ গান রেকর্ড করবেন এবং কোন্-কোন্ শিল্পীকে তাঁরা নিয়োগ করবেন এ সব বিষয়গুলি তাঁদেরই এক্তিয়ারভুক্ত। স্বতরাং এ বিষয়ে বিশেষ কোন শিল্পীর সঙ্গে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির কোন প্রকার আলাপ আলোচনা হওয়া সংগত নয় বলে মনে হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত রেকর্ড কোং-র কাছে জানানো হয়। কেন স্বর অনুমোদিত হয় নি তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া পত্রের মাধ্যমে সম্ভব হয় না ; তবে বিশেষ বিশেষ কারণগুলি কোম্পানীকে জানানো হয়।

কিছুকাল যাবৎ রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার সময় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রাধান্য অত্যধিক পরিমাণে শোনা যেত যার জন্য অনেকাংশে রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত এবং নানা ধরনের বিদেশী স্বরের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা শক্ত হোত। এই নিয়ে

বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। আবহসংগীত যাহাতে শ্রুতিমধুর হয় এব গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা যন্ত্রসংগীত প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে সেই বিবেচনায় রবীন্দ্রসংগীতের উপযোগী যন্ত্রের ব্যবহার এবং প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সিদ্ধান্ত রেকর্ড কোংগুলিতে, রেডিওতে, চলচ্চিত্র পরিচালকগণকে অবহিত করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের একটি প্রতিলিপি তোমার অবগতির জন্য পাঠানো হল।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং শ্রীযুক্ত শোভন সাহার সঙ্গে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। তিনিও ইতিপূর্বে তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন বললেন। তোমার পূর্বে রেকর্ড করা কয়েকটি গান রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে বার করে দিচ্ছেন এবং বাকী গানগুলি শীঘ্রই বার করবেন। যে তিনটি গানের সুর অনুমোদিত হয়নি সেই টেপগুলিও খুঁজে পাঠিয়ে দেবেন বললেন পুনর্বার পরীক্ষার জন্য।

ইতিমধ্যে ইনরেকার "রবিপ্রণাম"—২৫ বৈশাখ ১৩৮৪ নূতন প্রকাশিত রেকর্ডের তালিকা আমাদের হস্তগত হয়েছে। ঐ তালিকায় তোমার ছটি গানের ৩৩⅓ আর পি এম মিনি লং প্লে রেকর্ড প্রকাশিত বলে উল্লেখ আছে। ইন্‌রেকাও সেই বিষয় আমাদের জানিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত শোভন সাহার সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে জানা গেল যে রেকর্ড করার সময় প্রিল্যুড এবং ইন্‌টারল্যুড মিউজিক ব্যবহার করা সম্পর্কে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি কয়েকটি উপযোগী বাদ্যযন্ত্রের প্রবর্তন ও প্রয়োগ-পদ্ধতির বিষয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাহা তোমার বিশেষ মনঃপূত হয়নি। উপরে উল্লেখিত তোমার দুটি পত্রে তোমার ঐ মনোভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। তাছাড়া ইতিপূর্বে কয়েকটি সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রপত্রিকায় এই সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিবৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার সময় প্রিল্যুড এবং ইণ্টারল্যুড মিউজিক ব্যবহার করা সম্পর্কে সকলে বিশেষ ভাবে সচেতন

হওয়াতে রেকর্ডের মান যে উচ্চমানের হয়েছে তা অনস্বীকার্য। আরও অধিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রহ্মসংগীতাবলী তোমার কণ্ঠে রেকর্ড করে রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে রেকর্ড কোং-র অগ্রণী হওয়া উচিত। তবে গান রেকর্ড করার সময় এমন পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া চাই যা ব্রহ্মসংগীতের উপযোগী হয়।

আশা করি তোমার শরীর এখন ভাল আছে।

ইতি

স্বাক্ষর…

(নৃপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র)

শ্রীযুক্ত দেবব্রত বিশ্বাস
১৭৪ই, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-২৯

শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এই চিঠির উত্তরে আমি যে চিঠি তাঁকে লিখেছিলাম তার প্রতিলিপি নিচে দিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ৩০।৫।৭৭

আপনার স্বাক্ষর দেওয়া ১৯।২০-৫-৭৭ তারিখের চিঠি পেলাম। আপনার ১৮।২।৭৪ তারিখের চিঠিতে আপনি আমায় টেলিফোনে আগাম ব্যবস্থা করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আদেশ করেছিলেন। তখন আমি চিঠি দিয়ে আপনাকে আমার ভাঙা স্বাস্থ্যের কথা জানিয়েছিলাম। হাঁপানী যে কখন আক্রমণ করে আগের থেকে কিছুই টের পাওয়া যায় না। সুতরাং আগের থেকে আপনাকে জানিয়ে পরে যদি স্বাস্থ্যের জন্য না যাওয়া হয় তখন নিজেকে অত্যন্ত দোষী মনে হত। এই ধরনের দুর্ঘটনা গত কয়েক বৎসরে অনেকবার ঘটেছে—তাই যোগাযোগ করবার সাহস পাইনি। তাছাড়া আপনার সঙ্গে দেখা না করার আরেকটি কারণও ছিল। আমার ১৮।২।৭৪ তারিখের চিঠিতে আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম যে

Music Board-এর পরীক্ষকরা আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট। তাঁরা যদি রেকর্ড করার ব্যাপারে আমায় Interpretation এবং Expression-এর স্বাধীনতা না দিতে চায় তাহলে তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া না করে চুপ করে থাকাটাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হয়—তাই রেকর্ড করাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ঐ চিঠিতে আমি আপনাকে আরো জানিয়েছিলাম যে আমার গানের রেকর্ড অনুমোদন করবার জন্য আপনাকে আমি চিঠি লিখিনি। আমি শুধু নূতন কতকগুলি যুক্তিহীন ও অর্থহীন নিয়মের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলাম। Music accompaniment, Interlude music, Various types of musical instrument-এর ব্যবহার এবং তালের ঝোঁক ইত্যাদি ব্যাপারে নতুন নতুন বিধিনিষেধ যাতে রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক-গায়িকাদের কাঁধে না চাপানো হয় তারই একটি ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে আমার বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে পরে আপনার কাছ থেকে কোনো চিঠি না পাওয়াতে আমার মনে হয়েছিল হয়তো আপনার পক্ষে ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি; কারণ আপনি নিজেই আপনার চিঠিতে জানিয়েছিলেন—"আমি তো সব জিনিসটা জানি না। জানইত সংগীত সমিতিতে Expert মতামত দিলে আমি শুধু record সম্বন্ধে চিঠিগুলি সই করিয়া দিই।" তাই আপনাকে এই ব্যাপারে বিরক্ত করতে চাইনি। একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে Expertদের অন্তরে Professional Jealousyর মত একটি ব্যাপার গভীরভাবে কাজ করছে; তাই এই তুচ্ছ ব্যাপারে আপনাকে আমি জড়াতে চাইনি।

অনেক সাংবাদিক আমার ঘরে এসে আমায় নানা ধরনের প্রশ্ন করছেন—তাঁদেরকে আমি কোনো কথাই বলিনি শুধু এইটুকুই বলেছি যে আমার গান রেকর্ড করা আমি নিজেই বন্ধ করেছি. বিশ্বভারতী Music Board বন্ধ করেন নি। তাঁরা তাঁদের পত্রপত্রিকায় কী লিখেছেন তা জানবার আমার কোনো আগ্রহ নেই। তবে শ্রীমতী সন্ধ্যা সেন নামী একজন মহিলা সাংবাদিক আমার এক নাতনীর সহপাঠিনী—তাঁকে আমি

তাঁর ছোটবেলা থেকে চিনি। তিনি একদিন আমার ঘরে এসে নানা ধরনের প্রশ্ন করায় আমার চিঠিপত্রের ফাইলটি এগিয়ে দিয়েছিলাম। সেই ফাইলে কলকাতার এবং কলকাতার বাইরের বহুলোকের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তরে আমি যা লিখেছিলাম তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীমতী সন্ধ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে অনেক কিছুই প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া কোনো সাংবাদিক বা খবরের কাগজের লোকদের আমি কোনো কথাই বলিনি।

গত ৮ই মের কয়েকদিন আগে 'যুগান্তর' পত্রিকার একজন স্টাফ-রিপোর্টার আমার ঘরে এসে এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার যা কথোপকথন হয়েছিল তা পুরোটা, স্থানাভাব বা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি ৭ই মে-র 'যুগান্তরে' প্রকাশ করেননি। তাঁর সঙ্গে আমার কী আলাপ আলোচনা হয়েছিল, আপনার অবগতির জন্যে নিচে লিখে জানাচ্ছি।

সেই 'যুগান্তরের' স্টাফ রিপোর্টার আমায় বললেন, তিনি নাকি শুনেছেন আমার অনুমোদিত গানের রেকর্ডগুলি আবার অনুমোদন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সুতরাং আমি আবার নতুন গান রেকর্ড করতে শুরু করব কিনা জানতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম Journalism-এর কোনো Degree তাঁর আছে কিনা এবং তিনি কতদিন ধরে এই সাংবাদিকতার কাজ করছেন। তিনি বললেন তাঁর কোনো Degree নেই কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বৎসরের। সেই সময়ে আমার ঘরে একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের তরুণ যুবক বসেছিলেন Journalism তিনি শিখেছেন, পড়েছেন এবং হালে কোনো একটি সংবাদপত্রেও কাজ পেয়েছেন। আমি 'যুগান্তর' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারকে জিজ্ঞেস করলাম যে 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্তাব্যক্তিরা যদি নিয়ম করেন যে Journalism সম্বন্ধে ঐ সামান্য অভিজ্ঞ তরুণ যুবকটির কাছে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে তিনি ঐ যুবকটির কাছে পরীক্ষা দিতে রাজী আছেন কিনা। উনি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন যে ঐ ব্যবস্থাতে কিছুতেই তিনি পরীক্ষা দিতে রাজী হবেন

না। আমি তখন জানতে চাইলাম যে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকদের নাম উনি জানেন কিনা। উনি চারটি নাম বললেন এবং ঠিকই বললেন। তখন আমি তাঁকে বোঝালাম যে ১৯২৭ সনে আমি প্রথম কলকাতায় আসি—এই খবর যুগান্তর পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৭ সনের আগে পূর্ববঙ্গে নানা ব্রহ্মমন্দিরে এবং নানা অনুষ্ঠানে আমি রবীন্দ্রসংগীত ও অন্যান্য ধরনের গান পরিবেশন করে শ্রোতাদেরকে খুশি করতে পেরেছি। ১৯২৭ সনের পর থেকে ১৯৭৬ সন পর্যন্ত কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে হাজার হাজার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদেরকে আনন্দ তো দিতে পেরেছিই—আমার নিজের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার অভিজ্ঞতাও বহুল পরিমাণে বাড়িয়েছি। কিন্তু সংগীতে আমার কোনো Degree বা Diploma নেই। আর, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট Exponents এবং Examiner (পরীক্ষক)-গণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সংগীতজগতে প্রবেশ করেছেন। তাঁরা বয়সে আমার চাইতে অনেক ছোট—সুতরাং তাঁদের অভিজ্ঞতাও আমার চাইতে অনেক কম। সেই সব পরীক্ষকদের কাছে যদি আমার রেকর্ড গান বিচার এবং পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়, তাহলে আমার আবার রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করতে রাজী হওয়া উচিত হবে কি-না, আমি জানতে চাইলাম। রিপোর্টার ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে চুপ করে কী ভাবতে শুরু করলেন। আবার তাঁকে বোঝালাম যে অনাদিদার অর্থাৎ পরলোকগত অনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের ওপর যখন রেকর্ড অনুমোদন করার ভার দেওয়া ছিল, তখন কোনো গান তাঁর কানে গোলমেলে ঠেকলে তিনি নিজে আমায় ডেকে পাঠাতেন অথবা যোগাযোগ করতেন, সব ব্যাপার জানতে চাইতেন, খোলাখুলি আলোচনা করতেন, এবং আমার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতেন। এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনাদিদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন; মিউজিক বোর্ড নতুন নতুন পরীক্ষক নিয়োগ করলেন। সেই

সময় রাজেশ্বরী দত্ত কয়েক দিনের জন্য বিদেশ থেকে এসে, অনাদিদার জায়গায় নতুন পরীক্ষকদের নাম শুনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চাইলেন এই অবস্থায় তাঁর রেকর্ড করা উচিত হবে কিনা। তখন আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে মিউজিক বোর্ডের একটা নিয়ম আছে কাউকে দিয়ে রেকর্ড অনুমোদন করিয়ে নেবার। সুতরাং ব্যাপারটি তাঁর ক্ষেত্রে নতুন শিল্পীদের মতো প্রযোজ্য হবে না—একটা নিয়ম-পালন অর্থাৎ formality মতোই হবে। তিনি তখন রেকর্ড করতে রাজী হলেন। কিন্তু আমার নিজের রেকর্ডের ব্যাপারে দেখলাম Music Board এর Expert Exponent-র রীতিমতো পরীক্ষক এবং Dictator-এর মনোবৃত্তি নিয়ে, অবান্তর এবং অযৌক্তিক কারণে আমার রেকর্ড নাকচ করে দিচ্ছেন। তাই ১৯৬৯ সনে রেকর্ড করা বন্ধ করে দিলাম। পরে অবশ্যি হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি—স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ১৯৭০ সনে আরো কয়েকটি গান আমি রেকর্ড করেছিলাম—কয়টি নাকচ হয়েছে—খবর নিইনি। তারপর থেকে আর কিছু করিনি। আমার এই সব কথা শুনবার পর, 'যুগান্তর' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ভদ্রলোক বললেন, Music Board-এর পরীক্ষকদের নতুন তালিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের নামও নাকি আছে। তাঁকে দিয়ে আমার রেকর্ড পরীক্ষা করানোতে আমার কোনো আপত্তি আছে কি না জানতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে জানালাম যে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু আমার চাইতে দুয়েক বৎসরের বড় কিন্তু সংগীত পরিবেশনের তাঁর অভিজ্ঞতা আমার চাইতে অনেক কম। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে আমি খুব ভাল করেই চিনি এবং জানি—তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ, তাই তাঁর হৃদয়টি অত্যন্ত কোমল। অর্থাৎ তিনি যা সত্য বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন সেই ব্যাপারে তাঁকে যদি কেউ উলটো বোঝান তাহলে তার প্রতিবাদ তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। তাই আমার আশঙ্কা, যদি জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সঙ্গে উপর্যুক্ত পরীক্ষকদের কাউকে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার সেই

জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যদি স্পষ্টভাষায় আমায় জানিয়ে দেন যে শুধু জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ওপরেই আমার রেকর্ড পরীক্ষা করবার দায়িত্ব দেওয়া হবে তাহলে আমি নিশ্চয়ই আবার রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করতে আরম্ভ করব। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীর Recording Engineerএর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে আমার নাকচ করা রেকর্ড Music Board আবার চেয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯৬৮-৬৯ সনে রেকর্ড করা কিছু Tape নাকি অজ্ঞাত কারণে damaged হয়ে গিয়েছে। যে সব Tape damaged হয়নি তা যদি অক্ষত অবস্থায় থাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছি এবং আমার যে সব গান অনুমোদিত ছিল সেই সব গানও কিছু কিছু Record তৈরী করে বাজারে ছাড়তে অনুরোধ জানিয়ে দিয়েছি। আগে ওই সব গান রেকর্ড করে বাজারে ছাড়তে আমিই নিষেধ করেছিলাম।

যুগান্তরে Staff Repoter-এর সঙ্গে আমার যা আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা আপনার অবগতির জন্যে এতক্ষণ লিখে জানালাম।

আপনার চিঠিতে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যার সম্বন্ধে আপনার ওয়াকিবহাল থাকবার কথা নয়। আপনি নিজেও তা আপনার আগেকার চিঠিতে আমায় জানিয়েছিলেন। সুতরাং আমার বিশ্বাস, আপনার এই চিঠিখানা যিনি খসড়া করেছেন, তাঁর নিজস্ব মতামতও এই চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে এবং সেই ব্যাপারে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। আপনার এবং তাঁর অবগতির জন্য আমার বক্তব্য পেশ করছি।

আপনার চিঠিতে লেখা হয়েছে—"সে সব বিশেষজ্ঞরা সুর পরীক্ষা করে মতামত দেন তাঁদের বিষয় বিশেষভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। এই নীতিতো বরাবরই অনুসৃত হয়ে আসছে। সুতরাং পূর্বের এবং বর্তমানের সুর অনুমোদনের পদ্ধতির মধ্যে কোনও প্রকার তারতম্য না থাকবারই কথা।" দেখা যাচ্ছে গান অনুমোদন করার ব্যাপারটি যেন

Military অথবা Diplomatic গোপনীয়তা রক্ষার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ অনাদিদার ওপর যখন এইসব কাজের দায়িত্ব ছিল তখন তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য মোটেই উৎসুক এবং উৎসাহী ছিলেন না। কোনো গান তাঁর কাছে গোলমেলে ঠেকলে তিনি সেই বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন—ঢাক্-গুড়্-গুড়্ ব্যাপার তখন মোটেই ছিল না। সুতরাং পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। তাছাড়া—গোপনীয় ব্যাপারটি কিছুতেই গোপন থাকে না, যিনি বা যাঁরা আমার গানগুলি অনুমোদন করেননি, তিনি বা তাঁরা "দেবব্রত বিশ্বাসের গান অমুক অমুক কারণে আটকে দিয়েছি" বলে প্রকাশ্যভাবে এবং গর্ব করে জাহির করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। ক্ষমতা পেলে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। সৌভাগ্য ক্রমে সেই খবরগুলি আমার কছে আগেই পৌঁছে যায়। পরে যখন Music Board-এর চিঠি Recording Companyতে আসে এবং Record Company যখন আমার গান অনুমোদন না করার কারণগুলি জানান তখন চিঠির বয়ানগুলির সঙ্গে পরীক্ষকগণের পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি মিলিয়ে নিয়েই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কে কোন গান আটকে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে "গোপনীয়" কিছুতেই গোপন থাকছে না।

আপনার চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের উপযোগী বাদ্যযন্ত্রের একটি তালিকাও আমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাতে সেইসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে নানা প্রকার নির্দেশও দেওয়া আছে। আপনার এই চিঠির শেষের দিকে লেখা আছে—"সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার সময় প্রিল্যুড এবং ইনটারল্যুড মিউজিক ব্যবহার করা সম্পর্কে সকলে বিশেষভাবে সচেতন হওয়াতে রেকর্ডের মান যে উচ্চমানের হয়েছে তা অনস্বীকার্য। আরও অধিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রহ্মসংগীতাবলী তোমার কণ্ঠে রেকর্ড করে রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে রেকর্ড কোম্পানীর অগ্রণী হওয়া উচিত। তবে গান রেকর্ড করার সময় এমন পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া চাই যা ব্রহ্মসংগীতের উপযোগী হয়।"

এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য সবিনয়ে আপনাকে জানাচ্ছি: (ক) রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আমার সব কথা আপনাকে লেখা আমার ১২।২।৭৪ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছিলাম—এই সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। ঐ বাদ্যযন্ত্রের তালিকাটি একজন ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি নিজেই তা গর্ব করে বলে বেড়ান এবং নানান পত্র-পত্রিকাতেও তা ব্যক্ত করেছেন। সেই মাননীয় ভদ্রমহোদয়ের রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করবার ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই সুতরাং তাঁর নির্দেশ খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বিষয়টি মানুষের মানসিক সংস্কার ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। আপনার এই চিঠি যিনি খসড়া করেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে বহুকাল পূর্বে ব্রহ্মমন্দিরে তবলা বাদ্যযন্ত্রটি প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু মানুষের মানসিক সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তবলা এবং আরো দুয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার গানের সঙ্গে বাজাবার চলন হয়েছে কিন্তু বাঁশী এবং ঢোল এখনও ব্রহ্মমন্দিরে ঠাঁই পায়নি। ভবিষ্যতে এই সংস্কার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে হয়তো আরো নানা যন্ত্র ব্রহ্মমন্দিরে বাজানো হবে। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মানসিকতার ব্যাপার, সাংস্কৃতিক নয়। তবে হালে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড শুনলে দেখা যায় যে কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী (তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন) উপরোক্ত তালিকাতে স্থান পায়নি এমন কিছু বাদ্যযন্ত্র তাঁদের রেকর্ডে ব্যবহার করেছেন এবং সেই রেকর্ড অনায়াসে মিউজিক বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে। সুতরাং তালিকা তালিকাই রয়ে গেছে, কোনো কাজে লাগেনি। তবে কী বিশেষ উদ্দেশ্যে তালিকাটি আপনার চিঠির সঙ্গে আমার কাছে পাঠানো হল তা জানি না।

(খ) চিঠিতে লেখা হয়েছে—ব্রহ্মসংগীত রেকর্ড করার বিষয়ে রেকর্ড কোম্পানীর অগ্রণী হওয়া উচিত। যিনি চিঠি খসড়া করেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন না যে Hindusthan Recording Company আমার রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করবার জন্যে সদা সর্বদা উদ্‌গ্রীব এবং অত্যন্ত

উৎসাহী। তাঁরা আমায় অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছেন কিন্তু Music Board অরাবীন্দ্রিক ও অসাংগীতিক পরিবেশের জন্য আমি নিজেই উৎসাহিত বোধ করিনি তাই তাঁদের বহুবারের অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

(গ) আপনার চিঠিতে শেষদিকে বলা হয়েছে—"তবে গান রেকর্ড করার সময় এমন পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া চাই যা ব্রহ্মসংগীতের উপযোগী হয়।"

এই ব্যাপারে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে—তা হল,

১। ব্রহ্মসংগীতের উপযোগী পরিবেশটি কী এবং সেই পরিবেশের কোনো সংজ্ঞা আছে কি-না;

২। কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাছে এই পরিবেশের ব্যাপারে আমার বিশেষভাবে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন কিনা এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কার কাছে সেই শিক্ষা আমি নিতে পারি—

৩। আমি কোনো ব্রহ্মসংগীতের রেকর্ড করলে, সেই রেকর্ডে ব্রহ্ম-সংগীতের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্ট হল কি-না তার বিচার কে বা কারা করবে?

৪। ব্রহ্মসংগীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আরো নানান ধরনের গান রচনা করেছিলেন; সেইসব গান রেকর্ড করার অধিকার কী আমার থাকবে না অথবা সেই অধিকার থেকে আমায় কি বঞ্চিত করা হল?

এইসব প্রশ্নের সমাধান কী ভাবে পাব আমি জানি না।

আপনার কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার চিঠি শেষ করছি। আমার বয়েস ছেষট্টি হয়ে গিয়েছে; আমার এই ভাঙা শরীর নিয়ে কদিন গান গাইতে পারব জানি না। তাই আমার রেকর্ড অনুমোদন করবার দায়িত্ব যদি আমার চাইতে বেশী বয়স্ক, বেশী অভিজ্ঞ যোগ্যতর কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং সেই ব্যক্তির নাম যদি আমায় জানানো হয় তাহলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি যে কদিন পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গান রেকর্ড করবার চেষ্টা করব। আপনি দয়া করে এই

ব্যাপারে যদি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম জানাই—

ইতি

আপনাদের

জর্জ

শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

আমার এই চিঠির উত্তরে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে বাংলা ভাষায় হাতে লেখা একটি চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠিখানায় স্বাক্ষর করেছিলেন শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কিন্তু চিঠিখানা যে তিনি তাঁর নিজের হাতে লেখেন নি তা দেখলেই বোঝা যায়। সেই চিঠির একটি প্রতিলিপিও দিলাম।

VISVA-BHARATI
MUSIC BOARD

10, Pretoria Street
Calcutta-700071

এম. বি। ৩৫৯

১৫।১৬ জুন-১৯৭৭

প্রীতিভাজনেষু,

জর্জ, আমার ১৯।২০ মে ১৯৭৭ তারিখের পত্রোত্তরে তোমার ৩০।৫।৭৭ তারিখের লেখা পত্রে উল্লেখিত বিস্তারিত বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হলাম।

সমগ্র বিষয়টি বিচার বিবেচনার জন্য বিশ্বভারতা সংগীত সমিতির আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হবে। সুর অনুমোদন করা আছে অথচ রেকর্ড কোং রেকর্ড বার করেন নি এমন ১৯টি গানের বিষয় পূর্বপত্রে তোমাকে জানিয়েছি তার মধ্যে ৬টি গানের মিনি লংপ্লে রেকর্ড বেরিয়েছে।

অবশিষ্ট গানগুলির রেকর্ড শিগ্রই বার করা হবে এই রূপ ইন্‌রেকোর শ্রীযুক্ত শোভন সাহা জানিয়েছেন।

আশাকরি তোমার শরীর এখন ভাল আছে।

ইতি

(স্বাক্ষর)······

(নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র)

উপরে এই চিঠিতে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হল "শিগ্রই" শব্দটি। চিঠিতে "শিগ্রই" শব্দটি যে ভাবে হ্রস ই দিয়ে লেখা হয়েছিল, আমি হুবহু সেই ভাবেই লিখেছি এবং এই শব্দটি এইভাবে লেখার ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্বই নেই।

কলকাতায় প্রকাশিত একটি সাময়িক পত্রিকা 'কলকাতা'র ১৯৭৪ সনের জুন-জুলাই সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ পড়ে জেনেছিলাম যে ১৯৭০ সনে নাকি একটি নতুন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড গঠিত হয়েছিল এবং সেই বোর্ডের সদস্য ছিলেন কয়েকজন জাস্টিস, অ্যাড্‌ভোকেট ও বিশ্বভারতী অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অনারারি সেক্রেটারী ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। কিন্তু ১৯৭০ সনের আগে মিউজিক বোর্ডের সদস্য কারা ছিলেন তা আমার জানা নেই। এই বোর্ডের অধিবেশন কোথায় এবং কখন হয় তাও আমার জানা নেই। যাইহোক যেহেতু রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ডগুলি বিচার এবং অনুমোদন করার জন্য কয়েকজন গায়কগায়িকার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেইহেতু এটা সহজেই বোধগম্য হয় যে মিউজিক বোর্ডের সদস্যরা রবীন্দ্রসংগীতে খুব বেশী পোক্ত বা দক্ষ ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষর দেওয়া উপর্যুক্ত চিঠিতে যখন জানলাম যে আমার রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ডের

ব্যাপারে সমগ্র বিষয়টি বিচার বিবেচনার জন্য বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অ-গায়ক সদস্যদের অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হবে তখন আমি সত্যি সত্যি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম : কারণ অন্য কোনো রবীন্দ্রসংগীত গায়কগায়িকার ব্যাপারে এই ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা (অথবা Modus operandi) গ্রহণ করা হয়েছিল বলে আমি শুনিওনি, জানতামও না।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আমল থেকে পরিচিত, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত বহু বৎসর আগেকার একটি ফিল্মের গানের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ে গেল। গানটি ছিল—"এই তুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি, সব সত্যি।"

নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের স্বাক্ষর দেওয়া বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের ১৫।১৬ জুন ১৯৭৭ তারিখের চিঠি পাবার পর বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত হল কিনা আমি জানতে পারিনি। তাই তিন মাস পর ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ তারিখে আমি শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে আবার একটি চিঠি পাঠালাম। সেই চিঠির প্রতিলিপি :

১৯।৯।৭৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৫।১৬ জুন ১৯৭৭ তারিখের চিঠিতে আপনি জানিয়েছিলেন যে আমার সমগ্র বিষয়টি বিচার বিবেচনার জন্য বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হবে। তিন মাস অতীত হয়ে গেল, কিন্তু সমিতির সিদ্ধান্ত কিছু হয়েছে কিনা আমি কিছুই জানতে পারিনি। সেই সিদ্ধান্তের জন্য আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে তা আমাকে জানাবার নির্দেশ দিলে অত্যন্ত উপকৃত হব।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণামান্তে

জর্জ

আমার এই চিঠির উত্তরে শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের স্বাক্ষর লাগানো যে চিঠি পেয়েছিলাম তার প্রতিলিপি :

VISVA-BHARATI
MUSIC BOARD

10 Pretoria St.
Calcutta-71

এম. বি। ৬০০ ২৭-৯-৭৭

প্রীতিভাজনেষু জর্জ,

তোমার ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ তারিখের চিঠিখানি যথাসময়ে পেয়েছি। আমার পূর্ব পত্রে ১৫।১৬ জুন ১৯৭৭ তারিখের এম, বি। ৩৯৯ নম্বর পত্রে জানিয়েছি যে সমগ্র বিষয়টি বিচার বিবেচনার জন্য বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হবে। এখনও পর্যন্ত সংগীত সমিতির কোন অধিবেশন না হওয়ায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি।

আশাকরি তোমার শরীর এখন ভাল আছে।

ইতি
(স্বাক্ষর)······
(নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র)

প্রায় সাত-আট বৎসর আগে ১৯৭০-৭১ সনে আমি অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত আমাদের রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করে দিয়েছিলাম এবং সেই গানগুলির রেকর্ড প্রকাশ করতে কোম্পানীকে আমিই নিষেধ করেছিলাম। ১৯৭৬ সনের শেষে রেকর্ডিং কোম্পানীকে সেই গানগুলির রেকর্ড প্রকাশ করতে আমিই অনুরোধ করেছিলাম।

---

* উল্লিখিত নম্বরটি ভুল। ৩৯৯-এর বদলে ৩৫৯ হবে। এই অসঙ্গতি মূল চিঠিতেই রয়েছে। —লেখক

এই ব্যাপারটি আমি আগেও উল্লেখ করেছি। সেই পুরানো গানগুলির থেকে রেকর্ডিং কোম্পানী ১৯৭৭ সনে কয়েকটি গান এবং ১৯৭৮ সনে কয়েকটি গান রেকর্ড করে প্রকাশ করেছেন। আরো কয়েকটি গান এখনো বাকী আছে—সেগুলিও হয়তো ভবিষ্যতে রেকর্ড করে প্রকাশ করা হবে। ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সনে প্রকাশিত রেকর্ডগুলি দেখে অনেকেই মনে করেছেন অথবা ধরে নিয়েছেন যে আমি আবার নতুন করে রেকর্ড করতে শুরু করেছি এবং সেজন্য তাঁরা অনেকেই খুব আনন্দিত হয়ে আমায় এই ব্যাপারে চিঠি দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু আমি ১৯৭০-৭১ সনের পরে আর কোনো রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড করিনি এবং আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আর হয়তো রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করবার সুযোগ আমার হবে না। মনে খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি আমার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হয়ে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকেই আমার রেকর্ড অনুমোদন করার দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু হঠাৎ একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম যে জ্যোতিরিন্দ্র—আমাদের বটুক—২৫শে অক্টোবর ১৯৭৭ তারিখে আমাদের সবাইকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেল। বটুক চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রসংগীত-জগতে আমি হয়ে গিয়েছিলাম "হরিজন", সেই হরিজন হয়েই আমার জীবনের শেষ কয়টি দিন কাটাতে হবে।

শুনতে পাই হরিজনদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চারদিকে নানা চেষ্টা চালানো হচ্ছে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতজগতে আমার মতো হরিজনকে একটু ঠাঁই করে দেবার চেষ্টা হবে কিনা জানি না। যদি ভবিষ্যতে সেই সৌভাগ্য আমার কখনো হয়, তখন হয়তো আমার কণ্ঠস্বর আমার কণ্ঠ ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে কিংবা আমি হয়তো এই জগৎ থেকে হয়ে যাব উধাও।

উপসংহার

"ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত" বইটি প্রকাশিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান থেকে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অনেক শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে আমি বেশ কিছু সংখ্যক চিঠি পেয়েছি এবং এখনও পেয়ে যাচ্ছি, কারণ বইটিতে আমার বর্তমান ঠিকানার উল্লেখ আছে। এইসব পত্র লেখক-লেখিকাদের অধিকাংশই আমার অচেনা। তাঁদের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমি আমার সাধ্যমত দিয়ে দিই। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আমি অনেকের কাছ থেকেই পাই—তবে সেটা ঠিক প্রশ্ন নয়—খানিকটা অভিযোগের মত। এই পত্রলেখক-লেখিকাদের অনেকেই আমায় "অভিমানী" বা "অত্যন্ত অভিমানী" আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁদের মতে আমি নাকি অভিমান করে গত কয়েক বৎসর রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করা বন্ধ করে আমাদের দেশবাসীর প্রতি অবিচার করছি; আবার অনেকেই লিখেছেন এইভাবে আমাদের দেশবাসীদের বঞ্চিত করছি। তাঁদের চিঠির উত্তরে আমার চিঠিতে আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এই ব্যাপারে আমার কোন অভিমান বা রাগ নেই—আছে শুধু সামান্য একটু আত্মসম্মানবোধ। আমার এই সামান্য আত্মসম্মানবোধটুকু বিসর্জন দিয়ে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কয়েকজন মাঝারি কর্তাদের কতকগুলি অযৌক্তিক এবং অসংগত নির্দেশ মেনে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করার মত মানসিকতা আমার একেবারেই নেই।

এই বইটি প্রকাশিত হবার পর হঠাৎ বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে আবার একটি চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠির প্রথম নম্বর-এম. বি. ৪১৫, তারিখ সেপ্টেম্বর ২-৭-১৯৭৮। সেই চিঠি থেকে অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করলাম :

"পত্রে উল্লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংগীত সমিতির অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। অতঃপর গুরুদেবের গানের সুর অনুমোদন সম্পর্কে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। পূর্বপদ্ধতিতেও কোন প্রকার অসংগতি ছিল না।"

এই চিঠিখানা পেয়ে গত ১২।৯।৭৮ তারিখে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির অনারারি সেক্রেটারী মহাশয়কে আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম। সেই চিঠির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে নিচে উদ্ধৃত করলাম :

'পূর্ব পদ্ধতিতেও কোন প্রকাব অসংগতি ছিলনা' এই কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার। সেই পদ্ধতিতে নানা ধরনের অসংগত এবং অযৌক্তিক ব্যাপার ছিল বলেই সেই ব্যাপারগুলি বিশ্লেষণ করে আমার প্রতিবাদ আমি জানিয়েছিলাম এবং সেই কারণেই সংগীত সমিতি আমায় জানিয়েছিলেন যে সমগ্র বিষয়টি বিচার বিবেচনার জন্য বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হবে। কিন্তু পূর্ব পদ্ধতিতেও কোন প্রকার অসংগতি ছিলনা জানা সত্ত্বেও আমার রেকর্ড করার ব্যাপারটি সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপিত করার কী প্রয়োজন ছিল তা আমার বোধগম্য হয়নি। তাছাড়া সমিতির কী সিদ্ধান্ত হল এবং অতঃপর গুরুদেবের গানের সুর অনুমোদন সম্পর্কে কী কারণে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয়নি তাও আমায় জানানো হলনা।

আমার এই চিঠির উত্তরে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি ১।১২।৭৮ তারিখের একটি চিঠিতে জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ডিং

সম্বন্ধে সংগীত সমিতি কতকগুলি বিধিনিষেধ ঠিক করে দিয়েছে। তাই সর্তগুলি রেকর্ডিং কোম্পানী এবং সমিতির সকলকে মানতে হয় এবং মানাও উচিত। তারপর আমাকে জানানো হয়েছে যে আবার আগামী সমিতির মিটিং-এ সমস্ত বিষয়টি আলোচনা এবং বিবেচনা করার চেষ্টা করা হবে। সমিতির সদস্যরা যা স্থির করেন বা নির্দেশ দেন তা আমাকে জানানো হবে।

সুতরাং আমার এই বইএর পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমার রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের ব্যাপারে সমিতির অধিবেশন একবার হয়েছে, আরেকবার হবে এই আশ্বাসও আমায় দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের অধিবেশনের প্রয়োজন আর কতবার হবে আমি জানিনা এবং আসল সমস্যাটির কোন সমাধান হবে কিনা তাও আমি বুঝতে পারছিনা।

আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছিলাম যে—যেসব বিধি নিষেধের কথা সংগীতসমিতির চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব বিধিনিষেধ কয়েকজন ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী গায়ক-গায়িকাদের রেকর্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়না। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার হাতে লিখিত কোন দলিলপত্র অথবা প্রমাণ নেই ; তাই নিশ্চিতভাবে কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা অথবা মন্তব্য করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা লিখবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

১। ১৯৬৯ সনে আমার একটি গান সংগীত সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি ; সেই ব্যাপারে একটি কারণ দেখানো হয়েছিল— "The song itself is not sung according to notation"। আমার মনে হয় অনেক পাঠক-পাঠিকা আছেন যাঁরা গানের স্বরলিপি পড়তে এবং বুঝতে পারেন। তাঁরা যদি একটু কষ্ট করে খুঁজে দেখতে

চেষ্টা করেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন ১৯৬৯ সনের পরেও কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড অনুমোদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেই সব গানের সুর ঠিক ছাপানো স্বরলিপি অনুযায়ী গাওয়া হয়নি।

২। বেশ কয়েক বৎসর আগে কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়ে জানতে পেরেছিলাম—১৯৭৩ সনে এপ্রিল মাসে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড লিখিতভাবে নিয়ম জারি করেছিলেন যে, যে গানের মুদ্রিত স্বরলিপি নেই—রেকর্ডের জন্য সে গান গৃহীত হবে না। রবীন্দ্রসংগীতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা একটু খুঁজে দেখলেই দেখতে পাবেন, উপর্যুক্ত নিয়ম জারি হবার পরেও এমন রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল যে গানের ছাপানো স্বরলিপি ছিলনা। এখন ছাপানো হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই।

এই তথ্যগুলি বিশেষভাবে লিখবার উদ্দেশ্য হল "বিধিনিষেধ" কথাগুলি শুধুই বাত-কী-বাত। ব্যক্তিবিশেষে এই সব বিধিনিষেধের বাঁধন আলগা হয়ে যায়।

যাই হোক, সংগীত সমিতির আদালতের রায় কবে প্রকাশিত হবে জানিনা। গত সাত-আট বৎসর আমি কোন রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করিনি। ইতিমধ্যে আমার বয়সও অনেক বেড়ে গিয়েছে। শ্বাসরোগ এবং নানা ধরনের জটিল রোগে ভুগে ভুগে গান গাইবার শক্তিও আমার নিঃশেষিত। ভবিষ্যতে সংগীত সমিতির রায় আমার সপক্ষে হলেও রেকর্ড করবার মত স্বাস্থ্য আমার আর নেই, শক্তিও নেই। তাই গান গেয়ে যে অসংখ্য দেশবাসীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা সারাজীবন কুড়িয়ে আমি ধন্য হয়েছি, তাঁদের কাছে আমার বিনীত মিনতি—তাঁরা যেন আমায় ভুল বুঝে আমায় দোষারোপ করে আমার প্রতি অবিচার না করেন। আমি আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতে পারিনি কিন্তু আমি **সত্যিই অভিমানী নই**।